শিশু সৈনিকের আত্মকথা

আইভান মেলভিন রজার্স

দ্য চাইল্ড সোলজার

আশরাফ আল দীন অনূদিত

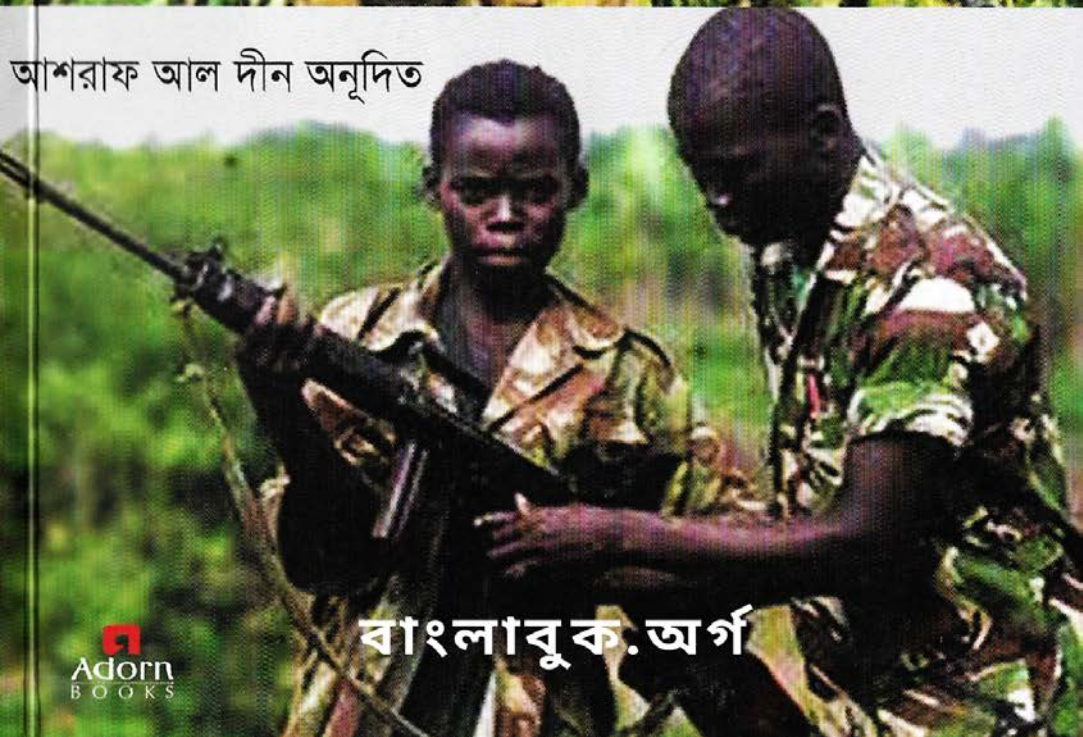

বাংলাবুক.অর্গ

Adorn
BOOKS

পশ্চিম আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ সিয়েরা লিয়ন এক দশক স্থায়ী গৃহযুদ্ধের কারণে বিধ্বস্ত হয়। নিহত ও আহতদের বাদ দিয়েও সেদেশের বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোরের জীবন বিপর্যস্ত ও তছনছ হয়ে পড়ে। কারণ তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে চাইল্ড সোলজার বা শিশু সৈনিকে পরিণত হয়েছিল। অবুঝ নির্মমতায় তারা অত্যাচার চালিয়েছে অন্যদের ওপর, আবার নিজেরাও হয়েছে নিষ্ঠুরতার শিকার। যুদ্ধশেষে সকল প্রকার ফায়দা লুটেছে বড়রা। কেবল চাইল্ড সোলজাররাই ফিরে যেতে পারেনি জীবনের স্বাভাবিকতায়। ওরা বঞ্চিত হয়েছে নানাভাবে।

সিয়েরা লিয়নের আইভান মাত্র দশ বছর বয়সেই যুদ্ধের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল চাইল্ড সোলজার হিসেবে। সশস্ত্র যুদ্ধের সব ধরনের অমানবিকতা ও নৃশংসতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে সে। অবশেষে বিশ বছর বয়সে যুদ্ধাহত হয়ে সে ছিটকে পড়ে জীবনের সব স্বস্তি থেকে। শেষ পর্যন্ত কী প্রতিদান পেল সে? এরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আইভান রজার্সের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *দ্য চাইল্ড সোলজার*।

অনুবাদক **আশরাফ আলী দীনে**র জন্ম চট্টগ্রামে, ২রা মে ১৯৫৪ সালে। তিনি মূলত কবি ও ছড়াকার। তার কাব্যগ্রন্থ *নির্জন এসেছিল আজ* প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং *রাত বাড়তে থাকে* ১৯৯০-এ। পত্রপত্রিকায় তার বেশ কিছু গল্প ও অনুবাদ-সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গবেষণাকর্মেও সম্পৃক্ত। ভ্রমণ করেছেন ভারত, সৌদি আরব, চীন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সিয়েরা লিয়ন, সেনেগাল ও যুক্তরাজ্য। চাইল্ড সোলজারদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের পাশাপাশি এ বিষয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হয়েছে তার। এই গ্রন্থ রচনা সেই অভিজ্ঞতারই প্রত্যক্ষ ফসল।

www.BanglaBook.org

Price : Bd. Tk. 250.00
US $ 12
UK £ 8
Ap-500-2013

Adorn BOOKS
অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
22 Segunbagicha Dhaka 1000 Bangladesh

ISBN 978-984-20-0300-4
9 789842 003004

www.adornbooks.com adornbd.com

আইভান মেলভিন রজার্সের

রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা

দ্য চাইল্ড সোলজার

অনুবাদ

আশরাফ আল দীন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

Adorn BOOKS
অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

১৪১৯

দ্য চাইল্ড সোলজার ❖ আইভান মেলভিন রজার্স
অনুবাদ : আশরাফ আল দীন
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ❖ জানুয়ারি ২০১৩
প্রথম প্রকাশ ❖ একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৪
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ। ফ্যাক্স ৯৩৬২৯৪৯ ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৪৬২৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮ এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৪০০০। ফোন : ৬১৬০১০
মুদ্রণ ❖ প্যানটোন কালার পয়েন্ট এন্ড এক্সেসরিজ, ১১/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব ❖ আইভান মেলভিন রজার্স
অনুবাদ স্বত্ব ❖ অনুবাদক
প্রচ্ছদ ❖ আশরাফ আল দীন
মূল্য ❖ দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

The Child Soldier ❖ Ivan Melvin Rogers
Translation : Ashraf Al Deen
[A Thrilling True Story]
Revised Second Edition Published in January 2013
First Published in Ekushey Book Fair 2004
Published by Syed Zakir Hussain ❖ Adorn Publication
22 Segun Bagicha, Dhaka 1000, Bangladesh. Fax 9362949 Tel 9347577, 8314629
www.adornbd.com www.adornbooks.com e-mail adorn@bol-online.com
Copyright Ivan Melvin Rogers
Translation right Translator
Cover Design Ashraf Al Deen
Price Tk. 250.00 US $ 12 UK £ 8

ISBN-978-984-20-0300-4
Ap-500-2013

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Adorn Publication.

উৎসর্গ

সিয়েরা লিয়নের
অগণিত দুর্ভাগা শিশু
এবং
বাংলাদেশি অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা

যাঁরা যুদ্ধ শেষে কমবেশি উপেক্ষিত
হয়েছেন আইভানের মত

গ্রন্থের পেছনের গল্প

সত্য ঘটনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চমকপ্রদ এই জীবনকথা যার জবানীতে লেখা হয়েছে তার নাম আইভান মেলভিন রজার্স। পশ্চিম আফ্রিকার সাগরপারের দেশ সিয়েরা লিয়নে ১৯৯১ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে সে হয়ে যায় একজন চাইল্ড সোলজার বা শিশু সৈনিক। নানা অনিবার্য পরিস্থিতি ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তার কৈশোর কেটেছে। হিংসা, দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র ও রাজনীতির ঘুরপাকে পড়ে জীবন কেটেছে পুরোপুরি স্বতন্ত্র ধারায়। গোয়েন্দা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে বড়দের অনেক গোপন বিষয়েও কলকাঠি নাড়ানোর সুযোগ পেয়েছে সে। বাধ্য হয়েই ২০০০ সাল পর্যন্ত বহুবিধ সামরিক কার্যকলাপ ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়েছে তাকে। তার জীবনকাহিনী এতটাই বিচিত্র যে এই সময়কালের ভিতর তিনটি পৃথক দেশের (সিয়েরা লিয়ন, লাইবেরিয়া ও গিনি) সেনানিবাসে কাজ করার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আইভানের সুযোগ হয়েছিল ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা ও ক্যামেরুনের ইয়াউন্ডেতে অনুষ্ঠিত ওয়ার চিলড্রেন সামিটগুলোতে অন্য চাইল্ড সোলজারদের অভিজ্ঞতার কথা শোনার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাইল্ড সোলজাররা যোগ দিয়েছিল সেই সম্মেলনে। শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ চাইল্ড সোলজারই অনেকটা তার মত পরিস্থিতির শিকার হয়ে এত কচি বয়সে সৈনিকে পরিণত হয়েছে। তাদের কারও পিতা-মাতা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, কেউ কেউ হয়েছে নিছক অপহরণের শিকার আর কেউ কেউ এমন হত-দরিদ্র পরিবারের সন্তান যে যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র সংঘর্ষে শামিল হয়ে যাওয়া।

দীর্ঘ তিন দশক ধরে আফ্রিকা মাহাদেশকে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বা গৃহযুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অন্য অনেক শিশুর মত এই ছেলেটিও তার প্রত্যক্ষ শিকার। তার নিজের প্রস্তুত করা একটি খসড়া লেখা আমার হাতে পড়েছিল। প্রথমে লাইবেরিয়া ও পরে সিয়েরা লিয়নের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের মাঝখানে থেকে আইভানের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তা, আমার মনে হয়, অন্যদের বলা যায়।

দীর্ঘ দশ বছরের ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে সর্বস্বান্ত হওয়ার পর সিয়েরা লিয়ন উঠে আসে আন্তর্জাতিক সংবাদের শিরোনামে। আমরা বাংলাদেশিরা এই দেশটি সম্বন্ধে জানতে পারি বিশেষভাবে যখন আমাদের সেনাবাহিনীর অনেকগুলো দল বা

BanglaBook.org

কন্টিনজেন্ট সেদেশে গেল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে। শান্তিরক্ষার কাজে আমাদের সৈন্যদলের ত্যাগ ও সাফল্য শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নয় বরং সমগ্র জাতির জন্য সুনাম বয়ে এনেছে আন্তর্জাতিকভাবে। এখন সেদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। বিদ্রোহীরা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ পরাজয় বরণ করলেও তারা তা মেনে নিয়েছে। এখন সেখানে চলছে পুনর্গঠনের কাজ।

কী অঘটন ঘটেছিল সিয়েরা লিয়নে? এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। সংক্ষেপে এটুকুই কেবল বলা যায় যে, শুধু একজন শাসকের জেদ ও খামখেয়ালিপনার জন্য কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ও সম্ভাবনাময় এই দেশটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল গণতন্ত্রের স্বপ্ন থেকে স্বৈরশাসনের আঁস্তাকুড়ে আর নিঃপতিত হয়েছিল ধ্বংসের রাহুগ্রাসে। সে এক করুণ ইতিহাস!

১৯৬১ সালের ২৭শে এপ্রিল সিয়েরা লিয়ন ব্রিটেনের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথমে বহুদলীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হন স্বাধীনতার স্থপতি ও দেশপ্রেমিক নেতা স্যার ডক্টর মিলটন এ এস মারগাই। ১৯৬৪ সালের ২৮শে এপ্রিল তার মৃত্যু হলে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল স্যার হেনরি লাইটফুট বোস্টন পরদিনই স্যার মিলটনের ছোট ভাই স্যার আলবার্ট মারগাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করান। কিন্তু স্যার আলবার্টের রাজনৈতিক কার্যক্রম দেশে বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং বিরোধীদলীয় প্রধান সাইকা স্টিভেন্সকে সামনে আসার সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধী দল ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৬৭ সালের ২১শে মার্চ সাইকা স্টিভেন্স প্রধানমন্ত্রী হন। নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তিনি সিয়েরা লিয়নকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিজে প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ছিলেন স্যার মিলটনের নীতির চরম বিরোধী। তিনি বামধারার রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং নামগোত্রহীন অপরিপক্বদের ক্ষমতায় তুলে এনে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবীণ ও মর্যাদাসম্পন্নদের সাথে সংঘাতের সূচনা করেছিলেন। তিনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ অপশাসনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করান। পরিস্থিতির অবনতি ও বার্ধক্যের কারণে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জোসেফ সাইদু মোমোকে একমাত্র রাজনৈতিক দল এপিসি (অল পার্টি কংগ্রেস)-এর প্রধান ও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে সাইকা স্টিভেন্স ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। ১৯৮৮ সালের ২৮শে মে সাইকা স্টিভেন্সের মৃত্যু হয়। দেশের অর্থনীতি ও সার্বিক

BanglaBook.org

অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকে ক্রমাগতভাবে। এ অবস্থায় ১৯৯১ সালের ২৩শে মার্চ রেভল্যুশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট (আরইউএফ) গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। অবসরপ্রাপ্ত সেনা-কর্পোরাল ফুদে সেইবানা সাঙ্কো এই বিদ্রোহী দলের নেতা। তিনি চেয়েছিলেন উগান্ডার মি. মুসাবেনির স্টাইলে একটি 'পিপলস আর্মি' গঠন করতে। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির 'গ্রিন বুক'-এর প্ররোচনা বা প্রচারণা মোতাবেক 'যুবকদের ক্ষমতায়ন'কে তারা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। প্রতিবেশী দেশ লাইবেরিয়ার স্বৈরশাসক চার্লস টেইলর বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এবং বিনিময়ে বিদ্রোহীদের অধিকৃত খনিগুলো থেকে আহৃত ডায়মন্ড গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালের ২৯শে এপ্রিল ক্যাপ্টেন ভ্যালেন্টাইন এসট্রেসার প্রেসিডেন্ট জোসেফ মোমোকে উৎখাত করে ন্যাশনাল প্রভিশনাল রুলিং কাউন্সিল (এনপিআরসি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন। ফুদে সাঙ্কোর আরইউএফ পরিচালিত বিদ্রোহ বা বুশ ওয়ার দমনে ব্যর্থতাজনিত হতাশা থেকে এই অভ্যুত্থানের জন্ম হয়। ১৯৯৬ সালের ১৬ই জানুয়ারি এসট্রেসারের সহকারী ক্যাপ্টেন (পরে ব্রিগেডিয়ার) জুলিয়াস মা'দা বিও ক্ষমতা দখল করেন এবং একই বছর ১৫ই মার্চ বহুদলীয় ও অবাধ নির্বাচন দেন। এতে শতকরা ৫৯.৫০ ভাগ ভোট পেয়ে প্রাক্তন জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও আইনজীবী আলহাজ ড. আহমেদ তেজান কাব্বাহ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৯৭ সালের ২৫শে মে একদল অবাধ্য সৈনিক কাব্বাহ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সামরিক জান্তা প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আরইউএফের সাহায্য গ্রহণ করে। আরইউএফ নেতা ফুদে সাঙ্কো জান্তার সাথে হাত মেলান এবং মেজর জনি পল করোমা আর্মর্ড ফোর্সেস রেভল্যুশনারি কাউন্সিল (এএফআরসি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালের ৩রা জুন জান্তা-সমর্থক এবং ইকোমগের (নাইজেরিয়ান আর্মির প্রাধান্যসমৃদ্ধ পশ্চিম আফ্রিকান যৌথ বাহিনী) মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১৯৯৭ সালের ২৩শে অক্টোবর জান্তা প্রতিনিধি ও পশ্চিম আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এক শান্তিচুক্তিতে রাজি হন যে, এপ্রিলের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট কাব্বাহকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হবে। ১৯৯৮ সালের ২৩শে জানুয়ারি এই শান্তিচুক্তি ব্যর্থ হওয়ায় জান্তা সমর্থক এবং যৌথ বাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে আবার প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি যৌথ বাহিনীর সৈন্যরা সামরিক জান্তাকে উৎখাত করে রাজধানী ফ্রি-টাউন দখল করে। ১০ই মার্চ প্রেসিডেন্ট কাব্বাহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র গিনিতে স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে রাজধানী ফ্রি-টাউনে ফিরে আসেন। ওদিকে আবার ৭ই মে জান্তা-সমর্থক সৈন্য ও বিদ্রোহীরা উত্তরাঞ্চলে

BanglaBook.org

আক্রমণ চালায়। এ সময় জান্তা-সমর্থক সৈন্য ও বিদ্রোহীদের মিলিত অত্যাচার থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে জনগণ গোত্রভিত্তিক সিভিল ডিফেন্স ফোর্স (সিডিএফ) বা মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলে এবং তারা সরকারের নিকট থেকে সীমিত পরিমাণ অস্ত্রসাহায্য লাভ করে। ধীরে ধীরে গৃহযুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৯৯৮ সালের ১৩ই জুলাই সিয়েরা লিয়নে একটি ছোট মিলিটারি অবজারভার দল পাঠানোর জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৩শে অক্টোবর দেশদ্রোহিতার অভিযোগে হাইকোর্ট বিদ্রোহী নেতা ফুদে সাঙ্কোকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। এতে বিদ্রেহীরা ক্ষেপে ওঠে। বিদ্রোহীদের দেয়া আলোচনার প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট কাব্বাহ প্রত্যাখ্যান করেন। বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি করে। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য নাইজেরিয়া যৌথ বাহিনীর অধীনে বাড়তি সৈন্য নিয়ে আসে। কিন্তু তাদের অফিসার ও সৈনিকদের অনেকেই ডায়মন্ড ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ ১৯৯৯ সালের ৬ই জানুয়ারি ১৫ হাজারেরও বেশি শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য ও আমেরিকা-ইউরোপের প্রচুর অর্থের সরবরাহসামগ্রীকে ব্যর্থ করে দিয়ে ফ্রি-টাউন আক্রমণকারী বিদ্রোহীরা প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় ভবন দখল করে নেয়। এ সময় বিদ্রোহী বাহিনীর বিরাট অংশ ছিল চাইল্ড সোলজার। ২২শে জানুয়ারি নাগাদ বিদ্রোহীরা ডায়মন্ডসমৃদ্ধ শহরগুলোসহ দেশের বৃহত্তর অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

১৯৯৯ সালের ৩রা জুন টোগোর রাজধানী লোমেতে প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর সরকার আর ফুদে সাঙ্কোর আরইউএফের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০০ সালের মে মাসে বিদ্রোহীরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে শান্তিরক্ষী বাহিনীর পাঁচ শতাধিক সদস্যকে বন্দি করে। পুনরায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ২০০১ সালে সকল বিদ্রোহী গ্রুপ তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়। সংক্ষেপে এই হল একটি সুখী জনপদের আত্মহননের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এর আগে ১৯৩১ সালে কোনো ডিস্ট্রিক্টে সর্বপ্রথম হীরার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ধীরে ধীরে হীরক উত্তোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং সিয়েরা লিয়নের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মূল খাত হয়ে দাঁড়ায় হীরক ব্যবসা। এছাড়াও সোনা, রুটাইল, বক্সাইট, লৌহ ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর অনেক খনি সেদেশে পাওয়া গেছে। অন্যদিকে অত্যন্ত উর্বর মাটির এই দেশ কফি, কাঠ, কোকো ও পাম-অয়েল রফতানি করে আয় করত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থনীতির এই দেশ কেবল ১০ বছরের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ফল হিসেবে লাভ করেছে একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও বিনষ্ট জনপদ। হীরক ব্যবসা বেদখল হয়ে

BanglaBook.org

গেছে, খনিগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কৃষিজ ও গবাদিপশুর উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন আগে। সংঘাতের ফল হিসেবে দেশজুড়ে বেঁচে আছে নানা বয়সের অসংখ্য বিকলাঙ্গ মানুষ। সংঘাতপূর্ণ দিনগুলোতে এদের হাত বা পা কেটে নিয়েছিল আরইউএফ ও সিডিএফ বিদ্রোহীরা। নারী এবং শিশুরাও রেহাই পায়নি এই অমানবিকতা থেকে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই নির্মমতাপূর্ণ কাজগুলো ওরা করিয়েছে প্রধানত চাইল্ড সোলজারদের দিয়েই।

দুয়েকজন মাত্র শাসকের অগণতান্ত্রিক মানসিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে বছরের পর বছর অশান্তির আগুনে পুড়েছে সিয়েরা লিয়ন। বাংলাদেশের অর্ধেক পরিমাণ এই দেশের সম্পদ ছিল অফুরন্ত অথচ মানুষ ছিল পঞ্চাশ লাখেরও কম। প্রায় দশ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে গৃহযুদ্ধে এবং দেশ ছেড়ে পালিয়েছে প্রায় সমপরিমাণ। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ি-ঘর ও সম্পদ। এই সুদীর্ঘ অমানবিক সংঘর্ষে হাজার হাজার শিশু-কিশোর নিহত হওয়া ছাড়াও আরও লাখ লাখ শিশু-কিশোর হয়েছে বিকলাঙ্গ, এতিম ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে তাদের স্বপ্নিল দিনগুলো মিথ্যা হয়ে গেছে এবং শিক্ষা-দীক্ষাহীনতা ও অযত্ন-অবহেলায় কেটে গেছে সময়। যে বয়সে হাতে কলম ও খেলনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা সে বয়সে তারা বাধ্য হয়েছে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে। শিশুদের মৌলিক অধিকারকে অবজ্ঞা ও হেয় করার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? শিশুদের প্রতি এই অবহেলা নিঃসন্দেহে সমগ্র মানবতার অপমান। শুধু সিয়েরা লিয়ন ও লাইবেরিয়া নয়, এভাবে অবিচার ও বঞ্চনা চাপিয়ে দিয়ে বড়দের সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিধিতে শিশু-কিশোরদের আজ অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হচ্ছে পৃথিবীর দেশে দেশে। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন অবুঝ ও অপরিণত বয়সের শিশু-কিশোরদের নিকট থেকে তাদের শৈশব ও কৈশোরকে ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার কারও নেই। পরিণত বয়সের মানুষের মনে এই সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলাম। যারা এই লক্ষ্যকে গ্রহণ করলেন তাদের কাছে অনুরোধ তারা যেন তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেন।

আরও একটি কথা সম্মানিত পাঠকদের জানিয়ে রাখি। আইভানের সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে ই-মেইলে। অর্থাভাবের কারণেই এখনও তার কোনো চিকিৎসা হয়নি। অক্ষমতা যুবক আইভানকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। এই প্রাচুর্যভরা পৃথিবীতে কতজনই তো পারত তাকে অর্থ দিয়ে নব-জীবন লাভে সাহায্য করতে। না, কেউ তা করেনি। শেষ পর্যন্ত জেনেছিলাম সে এখন ঘানায় আছে এক নিঃসন্তান বৃদ্ধার আশ্রয়ে। ইচ্ছা আছে যদি এই বই বিক্রি করে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে পারি তাহলে আইভানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াব বাংলাদেশের হৃদয় হতে।

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

দ্য চাইল্ড সোলজার

আত্মকথন

আমার নাম আইভান মেলভিন রজার্স। সকলে আইভান বলেই ডাকে। আমার আব্বা-আম্মা মিস্টার ও মিসেস রজার্স ছিলেন সিয়েরা লিয়নের দক্ষিণাঞ্চলীয় পুজেহুন ডিস্ট্রিক্টের গোলাহুন পার্কার অঞ্চলের বাসিন্দা। তাদের পারিবারিক নাম ছিল মোহাম্মদ মাসাকুই ও হান্নাহ নি মাসাকুই। জন্মসূত্রে তারা ছিলেন মুসলমান পরিবারের সদস্য। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে লেখাপড়া করতে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের চাহিদানুযায়ী তাদেরকে খ্রিস্টান নাম গ্রহণ করতে হয়। সিয়েরা লিয়নের মিশনারি স্কুলগুলোতে এখনও এই নিয়ম বলবৎ আছে। এখানে পড়তে আসা প্রত্যেক মুসলমান ছেলেমেয়েকেই একটি খ্রিস্টান নাম নিতে হয়। লেখাপড়া শেষ করার পর চাকরি-বাকরির সুযোগ-সুবিধা আর আধুনিক জীবনের বিবিধ প্রলোভনের কারণে অনেকেই খ্রিস্টান ধর্মকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে খ্রিস্টান নামটাতেই স্থিত হয়ে যান। আব্বা-আম্মাও সম্ভবত সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারণ আমার নাম এবং শৈশবের শিক্ষা সবকিছুর মাধ্যমে আমি নিজেকে বরাবরই খ্রিস্টান হিসেবে গণ্য করতে শিখেছি, মুসলমান হিসেবে নয়। আমার দাদা ছিলেন একজন মুসলমান সম্পন্ন কৃষক। তার চার ছেলের মধ্যে আব্বা ছিলেন তৃতীয়। আমার দাদি ছিলেন একই অঞ্চলের বাসিন্দা। দাদা-দাদির ছিল দশ ছেলে-মেয়ে। সিয়েরা লিয়নের গোটা বিশেক পৃথক গোত্রের মধ্যে প্রধান দুটি গোত্র হল তিমনি ও মেন্ডে। প্রায় প্রত্যেক গোত্রেরই নিজস্ব ভাষা ও সুনির্দিষ্ট অঞ্চল আছে। প্রধান গোত্রগুলোর ভাষা ভীষণ আলাদা ও বেশ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি তথা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রধান গোত্র দুটি একে অন্যের বিপক্ষে ক্রিয়াশীল ছিল বরাবরই। আব্বা-আম্মা দুজনই ছিলেন এদেশের অন্যতম প্রধান গোত্র মেন্ডের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান হয়েও তারা ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। কারণ তাদের দিয়েই সে যুগে স্কুলে যাওয়ার নিয়ম শুরু হয়। বিশ্বজুড়ে সক্রিয় রোমান ক্যাথলিক মিশন সেই সময় অনেকগুলো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সিয়েরা লিয়নে। এখনও বহুসংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ বিদেশি পাদ্রি এসকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যত্নের সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ গ্রহণের জন্য আব্বা-আম্মাকে গ্রাম ছেড়ে জেলা শহর পুজেহুনে এসে বসবাস করতে হয়।

আব্বা পুজেহুনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য বিভাগীয় শহর বো'তে চলে যান। বো বর্তমান সিয়েরা লিয়নের

BanglaBook.org

দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী। হাইস্কুল শেষ করে আব্বা জাতীয় রাজধানী ফ্রি-টাউনে চলে আসেন। সেখানে পড়াশোনা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা চলে যান। আমেরিকায় তিনি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এমআইটি) পড়াশোনা করেন। তিনি খুব মেধাবী ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। তার শিক্ষাজীবন ছিল বরাবরই সফলতায় পরিপূর্ণ। কর্মজীবনের শুরুতেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তিনি আমেরিকা, হাইতি, সাইপ্রাস ও কিউবায় চাকরি করেন।

বর্তমানে আমার দাদির বয়স সত্তর বছরের বেশি। তিনি থাকেন আমেরিকায় আমার এক মামার কাছে। আমেরিকা যাওয়ার আগে একবার গল্পচ্ছলে দাদি আমাকে আমার আব্বা সম্পর্কে বলেছিলেন। দীর্ঘদিন বিদেশে চাকরি করার পর আব্বা দেশে ফিরে এসে নিজ এলাকায় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত কোনো এক গ্রাম্য উৎসবে আব্বা ও আম্মার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আম্মা তখন রাজধানী ফ্রি-টাউনের জালা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আম্মার পড়াশোনা শেষ হলে তাদের বিয়ে হয় এবং তারা ফ্রি-টাউনে এসে বসবাস করতে শুরু করেন।

সিয়েরা লিয়নের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

ভাগ্য বিড়ম্বনার শুরু

প্রচণ্ড কৌতূহল থাকার পরও নিজের জন্ম ও কৈশোর সম্পর্কে আব্বা-আম্মার মুখ থেকে কিছু শোনার সুযোগ আমার হয়নি। তারা কেউই এখন বেঁচে নেই। তাই এ সম্পর্কে জানার জন্য আমাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই নানা রকম অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে। অনেকটা *দ্য রুটস*-এর লেখক অ্যালেক্স হ্যালির মত। আমেরিকার আফ্রো-আমেরিকান সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠা এই মানুষটি তার উৎস খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গিয়েছিলেন পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়ায়। সেখানে সাগরতীরবর্তী একটি গ্রামের এক মর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান পরিবারের সন্তান ছিলেন কুন্তা কিন্তে। দাস ব্যবসায়ীরা জোর করে ধরে নিয়ে কুন্তা কিন্তেকে আমেরিকায় বিক্রি করে দেয় ক্রীতদাস হিসেবে। আমেরিকান-খ্রিস্টান হয়েই তার বংশধর টিকে রইল সেদেশে। কয়েক শতাব্দী পরে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ হল এবং দাসেরা মুক্ত নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার ও সনদ পেল। সেই বংশধারার স্বাধীন মানুষ হলেন অ্যালেক্স হ্যালি। আমারও প্রায় তেমনই অবস্থা।

আত্মীয়-স্বজনের ভাষ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দলিল অনুযায়ী আমার জন্ম হয় ১৯৭৯ সালের ১০ই আগস্ট ফ্রি-টাউনের প্রিন্সেস ক্রিশ্চিয়ান মেটারনিটি হাসপাতালে। সিজারিয়ান অপারেশন সফল না হওয়ায় জন্মের পরপরই আমার আম্মার মৃত্যু হয়। দাদি বলেন, এ ঘটনার পর আমাকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালনের জন্য আম্মার যমজ বোনকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়। আমার ওই খালা ছিলেন কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। তাই আব্বা এই ব্যবস্থাটাকে মেনে নেননি। আব্বার ইচ্ছা ছিল তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী আমার দেখাশোনা করুন। তবে এটাও শুনেছি যে আব্বার সাথে তার সেই ভাবীর সুসম্পর্ক ছিল না। সে যা-ই হোক, জন্মের পর থেকে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত একজন ধাত্রী-মায়ের কাছেই আমি বড় হয়েছি। এদিকে বছর পার হতেই আব্বা আমেরিকায় ফিরে গেলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রিতা দো নামের এক ভদ্রমহিলার সাথে আব্বার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। তিনি ছিলেন এমআইটির মেডিক্যাল শাখার ছাত্রী এবং লাইবেরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্যামুয়েল কে. দো'র দূর-সম্পর্কের বোন। পরে আব্বা ওই ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন এবং আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৮১ সালে আমাকে আমেরিকায় বোস্টনের ম্যাসেচুসেটস-এ নিয়ে যাওয়া হয়। আমার সৎ-মা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহময়ী ও বিদুষী। আমার প্রতি তার স্নেহ-

BanglaBook.org

যত্নের কোনো ঘাটতি ছিল না। তাকে আমি আম্মা বলেই ডাকতাম। ১৯৮৩ সালে বোস্টনে আমার প্রাথমিক স্কুল শুরু হয়। বাসা ও স্কুল উভয় ক্ষেত্রেই আমার জীবন ছিল সীমাহীন আনন্দ ও সুখে পরিপূর্ণ। আব্বা-আম্মার সংসারে আর কোনো সন্তানাদি না থাকায় আমি অতিরিক্ত সুবিধাই ভোগ করেছি বলা যায়।

১৯৮৮ সালে লাইবেরিয়ার স্যামুয়েল দো সরকার আম্মাকে একটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন চাকরির প্রস্তাব দেয়। ওই চাকরির কারণেই ১৯৮৯ সালে আমাদের লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়ায় চলে যেতে হয়। আব্বাও ওখানে ভলান্টারি সার্ভিসেস ওভারসিজ (ভিএসও) নামে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন।

১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে আমি মনরোভিয়ার সেন্ট পল হাইস্কুলে পড়াশোনা শুরু করি। তখনকার পরিবেশটা ছিল অতি উন্নতমানের এবং জীবন ছিল অত্যন্ত আনন্দের। কারণ আমরা ছিলাম রাষ্ট্রের হাতেগোনা কয়েকটি পরিবারের মধ্যে একটি। লাইবেরিয়াতে বাস করেও আমাদের জীবনযাত্রা ছিল আমেরিকার চেয়েও আরামপ্রদ। আমার বন্ধুরা ছিল দেশের প্রথম সারির পরিবারগুলোর সন্তান। আম্মা চাইতেন আমি উন্নত পরিবেশে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবনে বড় কিছু হওয়ার লক্ষ্যে বেড়ে উঠি। হয়তো সে জন্যই তিনি আমাকে প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রাসাদে নিয়ে যেতেন। এটাকে বলা হত এক্সিকিউটিভ ম্যানশন।

১৯৮৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের আগে ঘুণাক্ষরেও কখনও ভাবিনি আমাদের এই সুখ ছিল ক্ষণস্থায়ী! সেবার ক্রিসমাস উৎসবের শুরুতেই ন্যাশনাল প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট অব লাইবেরিয়া (এনপিএফএল) আইভরি কোস্টের সীমান্ত থেকে আক্রমণ চালিয়ে লাইবেরিয়ার উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়। তখন এনপিএফএলের প্রধান ছিলেন (পরবর্তীতে লাইবেরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট) চার্লস জি. টেইলর। স্যামুয়েল কে. দো'র সরকার ছিল সামরিক শক্তিতে দুর্বল। তাই বিদ্রোহীদের আক্রমণ তারা সামাল দিতে পারেনি। ফলে ১৯৯০ সালের জুন মাসে নাগাদ এনপিএফএল রাজধানী মনরোভিয়ার অর্ধেকটাসহ সারা দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ জায়গা দখল করে নিল। এসময় অনেক বিদেশি নাগরিক সপরিবারে মনরোভিয়া ত্যাগ করেন। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির ফলে বেশ কিছু বিদেশির মত আমরাও রাজধানী মনরোভিয়াতে আটকা পড়ে গেলাম। মূলত আম্মার চাকরির ধরন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে তার আত্মীয়তার কারণে তিনি আগেভাগে দেশ ছেড়ে পালাতেও পারলেন না। নিরুপায় হয়ে আমরাও তার সাথেই থেকে গেলাম এবং পরিণতিতে এক অবর্ণনীয় দুরবস্থার শিকার হলাম।

আফ্রিকার যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মত লাইবেরিয়ার গৃহযুদ্ধও রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হতে গোত্রগত দ্বন্দ্বে পরিণত হল। ফলে এটা

BanglaBook.org

আক্রমণকারী গোত্র কর্তৃক অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে গণহত্যার রূপ ধারণ করল। স্যামুয়েল দো'র আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ তার স্বগোত্রীয় সবাইকেই নির্মমভাবে হত্যা, উচ্ছেদ বা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হল। আমার আব্বা-আম্মাও এই হত্যাযজ্ঞের নির্মম শিকার হলেন।

১৯৯০ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রীয় ভবনের নিকটস্থ প্লাঙ্কর এলাকায় সরকারের অনুগত বাহিনীর অবশিষ্টাংশ এবং এনপিএফএল বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘনীভূত হল। প্লাঙ্কর এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন খরান গোত্রের। রাষ্ট্রপ্রধান এবং আমার আম্মা ছিলেন সেই একই গোত্রভুক্ত। পুরো দু'দিনের প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা সমগ্র এলাকা দখল করে নেয়। তখনও রাষ্ট্রীয় ভবনটি লাইবেরীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দলের দখলে রয়ে যায়। ওটা ছিল ভারি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুরক্ষিত। ২৭শে জুন সকালবেলা বিদ্রোহীদের একটি দল আমাদের ঘরে এসে আমার মায়ের খোঁজ করল। ঘরে ছিলাম আমাদের কাজের বুয়া ও আম্মার এক বোনপোসহ আমরা মোট পাঁচজন। মে মাসে স্যামুয়েল দো নিহত হওয়ার পর থেকেই আমরা মূলত গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিলাম। খাদ্যদ্রব্য বলতে ঘরে তেমন কিছুই ছিল না। সামান্য যা কিছু ছিল তা রক্ষা করার জন্যই আব্বা-আম্মা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি লুকানো অবস্থা থেকেই শুনলাম, আব্বা বিদ্রোহীদের কাছে আম্মার প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন এবং বলছেন, এর বিনিময়ে তিনি তার সব টাকা-পয়সা বিদ্রোহীদের দিয়ে দেবেন। কিন্তু বোঝা গেল ওরা টাকা নিতে আগ্রহী নয়। কয়েক মিনিট পর আমরা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। এখনও আমার কানে বাজে আব্বা-আম্মার কাতর কণ্ঠ! আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম তারা গোঙাতে গোঙাতে বলছেন, 'হায় প্রভু! আমি মরে যাচ্ছি! হায় প্রভু! আমি মরে যাচ্ছি!' মুহূর্তেই জানা হয়ে গেল কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার! যদিও আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তবু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এক লাফে বেরিয়ে আসতে চাইলাম। কিন্তু আমাদের কাজের বুয়া আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখ চেপে রাখল। হত্যাকাণ্ডের পর বিদ্রোহীরা ঘরে ঢুকে লুটপাট শুরু করল রান্নাঘরের আলমিরার ভিতর আমরা লুকিয়ে ছিলাম। ভাগ্যিস ওরা আমাদেরকে খুঁজে পায়নি! যখন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না তখনও বেরিয়ে আসতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, যদি বিদ্রোহীরা কাছে-পিঠে থাকে! সম্ভবত বেশ কয়েক ঘণ্টা পর আমরা বের হয়ে এসে দেখলাম, জমাট বাঁধা রক্তের মধ্যে আব্বা ও আম্মার নিথর দেহ দুটি পড়ে আছে। মনে হয় না, কোনোভাবেই আমি ওই মুহূর্তের অনুভূতির কথা এবং সেই সাংঘাতিক দিনের কথা কাউকে বোঝাতে পারব! পরে আমরা আমাদের পারিবারিক বন্ধু ও প্রতিবেশী এক লেবাননি ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনিও পরিবার নিয়ে নিজ বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন

BanglaBook.org

তিনি তার বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমার ছোটভাইয়ের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তার বাড়িতেই ছিলাম। আমার ওই মামা ছিলেন সৈনিক ও স্যামুয়েল দো'র বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদের একজন। তিনি রাষ্ট্রীয় ভবনেই লুকিয়ে ছিলেন। অনেক কসরত করে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদেরকে এসওএস চিলড্রেন হোমে পৌঁছে দিলেন। তিনি চলে যাওয়ার সময় তার বোনপোকে সাথে নিয়ে গেলেন। এরপর থেকে এপর্যন্ত আমি তাদের আর দেখিনি বা তাদের সম্পর্কে কোনো খবরও শুনিনি। এভাবেই অতি অল্প বয়সে আমি হয়ে গেলাম একজন অভিভাবকহীন এতিম! এতবড় পৃথিবীতে আমাকে দেখাশোনার কেউ রইল না।

সিয়েরা লিয়নের রেভল্যুশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্টের চাইল্ড সোলজার বাহিনী

লাইবেরিয়া থেকে সিয়েরা লিয়ন

রাজধানী মনরোভিয়ার এসওএস এতিমখানাতে তখন আমার মত অনেক শিশু অবস্থান করছিল। এদিকে দিনের পর দিন দেশের অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। যত্রতত্র সংঘর্ষ ও মারামারি হচ্ছিল লাইবেরিয়ায় বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে। প্রাণের নিরাপত্তার কথা ভেবে এতিমখানা কর্তৃপক্ষ তখন নিকটতম ও নিরাপদ কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আমাদের স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিল। সেই মোতাবেক আমাদেরকে সিয়েরা লিয়ন নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের সেই যাত্রা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। কারণ লাইবেরিয়া ছেড়ে যাওয়ার জন্য জলপথ বা আকাশপথ তখন খোলা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে স্থলপথেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যার পুরোটাই ছিল বিদ্রোহীদের দখলে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার সহযোগিতায় আমার মত প্রায় সোয়া চারশ' অনাথ শিশুকে ছয়টি বাসে বোঝাই করা হয়। বাসে উড়িয়ে দেয়া হয় রেডক্রসের পতাকা। রেডক্রসের কর্মকর্তারাও আমাদের সঙ্গী হলেন। পথে দেখলাম অসংখ্য মৃতদেহ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়ি পড়ে আছে। বিদ্রোহীদের অনেকগুলো চেকপোস্ট পার হয়ে আমরা মনরোভিয়া থেকে সিয়েরা লিয়নের বো শহরের নিকটবর্তী সীমান্তে এসে পৌঁছলাম। অবশেষে আমরা পা রাখলাম সিয়েরা লিয়নের শান্ত ও নিরাপদ মাটিতে। লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়া থেকে যাত্রা করে বিদ্রোহীদের অনেকগুলো চেকপোস্ট ও বাধা অতিক্রম করে সিয়েরা লিয়নের কেনেমা পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল মোট তিন দিন। ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে আমরা কেনেমা পৌঁছলাম। ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থা এবং আরও অনেক সংগঠন, যারা লাইরেরিয়ার শরণার্থীদের সিয়েরা লিয়নে অবস্থানের ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে, তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমাদের জন্য সবকিছু গোছানো হয়ে গেল, এমনকি প্রত্যেকের জন্য স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। আমাদের প্রায় ৯০ ভাগ শিশুরই পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের অবস্থানের ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্য এতিমখানা কর্তৃপক্ষের জানা ছিল না। তাই আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার পক্ষ থেকে দেশব্যাপী পরিবার-অনুসন্ধানের একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। এ কাজে তারা উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে। তারা সিয়েরা লিয়নে অনেকের আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে

BanglaBook.org

তাদের নিজ নিজ গোত্রের বা বংশের শিশুকে এতিমখানা থেকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যায়।

কেনেমাতে আমাদের জীবন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। অবশ্য এতিমখানার জীবনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে আমার মত অনেকেরই বেশ কষ্ট হচ্ছিল। আমি ধীরে ধীরে এতিমখানার লোকদের প্রিয়ভাজন হতে শুরু করলাম। কিন্তু তাদের বাড়তি যত্নের পরও আমার মনমরা অবস্থা ঘুচল না। আব্বা-আম্মার অস্বাভাবিক মৃত্যুর স্মৃতিটা আমাকে তখনও তাড়া করে বেড়াত। ছোটবেলায় আমি ছিলাম বেশ মোটাসোটা। মনরোভিয়ার বন্ধুরা আমাকে তাই রসিকতা করে ডাকত 'বিবিডি'—যার ব্যাখ্যা হচ্ছে 'ব্যাবিলন বুল ডগ'। ভালো ভালো খাবার আমি খুব পছন্দ করতাম অথচ এখানে এসে আমি বাধ্য হলাম খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিতে। এতে আমার জীবনে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা লিখে বা বলে বোঝানো মুশকিল! আমার মনের সেদিনের প্রকৃত অবস্থার কথা কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। অনাথ হয়ে গিয়ে আমি সম্পূর্ণ এক অনভ্যস্ততার মধ্যে পড়ে গেলাম! আমি সব সময়ই আব্বা-আম্মার সাথে থেকেছি। ওই অবস্থাতেই ছিল আমার সমস্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। এখন তাদের অবর্তমানে আমার সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

১৯৯১ সালের ২৩শে মার্চ পর্যন্ত সবকিছু মোটামুটিভাবে চলছিল। ওই দিন সিয়েরা লিয়ন সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কর্পোরাল ফুদে সেইবানা সাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন রেভল্যুশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট (আরইউএফ) লাইবেরিয়ার ভিতর থেকে সিয়েরা লিয়নের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। শুরু হয়ে গেল রক্তপাত ও হিংসা-প্রতিহিংসার খেলা। যেখানে আমরা এসেছিলাম শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য, সেই শান্ত-সুন্দর দেশটিতে শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তলোলুপতার কায়কারবার। যে দলটি প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করল দেখা গেল তার সিংহভাগ লোকই প্রতিবেশী দুই দেশ লাইবেরিয়া ও বুরকিনা ফাসোর নাগরিক। লাইবেরিয়ার অভ্যন্তর থেকে আরইউএফ আক্রমণ পরিচালনা করায় সিয়েরা লিয়নের অধিকাংশ লোক আমাদের মত লাইবেরীয় শরণার্থীদের প্রতি বিরক্ত এমনকি রীতিমত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গেল। অথচ এরাই মাত্র ক'দিন আগে আপন আগ্রহে লাইবেরীয়দের নিজ দেশে স্থান দিয়েছিল।

এর ফল যা দাঁড়াল তা হল, সিয়েরা লিয়নে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার কারণে বিদেশিরা এই দেশ ত্যাগ করতে শুরু করল। ফলে বিভিন্ন এনজিও এবং দাতা সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দায়িত্ব এদেশীয় কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেল। বিদেশিরা চলে যাওয়ার পর এতিমখানা ও শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাই সাংঘাতিকভাবে কমে

BanglaBook.org

গেল। স্থানীয় কর্মচারীরা আমাদের জন্য বরাদ্দ করা খাদ্যদ্রব্য কেনেমার অধিবাসীদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করল। রিফিউজিদের কার্ডগুলো স্থানীয় লোকদের ঘরে ঘরে চলে গেল, যাতে তারা সরাসরি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারে। অব্যবস্থার ফলে ইউএনএইচসিআরের পক্ষে কেনেমায় লাইবেরীয় রিফিউজিদের খাবার সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্থানীয় কর্মচারীরা বাইরে থেকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসে এতিমখানার খাদ্যদ্রব্যের উপর ভাগ বসানোর ব্যবস্থা পাকা করে। এই ছেলে-মেয়েদের কেউই এতিম ছিল না। স্থানীয় কর্মচারীরা আমাদের কোনো যত্নই নিচ্ছিল না। এতিমখানার অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকে। অবস্থা এত করুণ হয় যে, কেনেমায় বসবাসকারী কিছু লাইবেরীয় পরিবার তাদের বৃহত্তর গোত্রের মান-সম্মানের কথা ভেবে স্বগোত্রীয় এতিমদের নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে যায়। অধিকাংশ অনাথ শিশু এতিমখানা ছেড়ে চলে যাওয়ায় এক সময় ওটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

আমরা যারা প্রকৃতপক্ষে লাইরেরিয়ার নাগরিক নই তাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কেউ আগ্রহ দেখাল না। তাই দৈনিক একবেলা খাবার খেয়েও আমরা এতিমখানায় পড়ে রইলাম। এমন অবস্থায় আমার কিছু বন্ধু রাস্তায় ভিক্ষা করতে শুরু করল। এতিমদের মধ্যে আমার ভাগ্যই তুলনামূলক সুপ্রসন্ন ছিল বলতে পারি। কারণ স্থানীয় কর্মচারীদের কেউ কেউ আমাকে খুবই ভালোবাসতেন এবং আমার বিশেষ যত্ন নিতেন। এই অবস্থাটাই আমাকে শেষ পর্যন্ত রাস্তার ভিক্ষুক হওয়া থেকে রক্ষা করে। অবশেষে একদিন এতিমখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমি কী করব ভেবে পেলাম না। সেই দুর্যোগের সময় তেন্নে রজার্স নামে এক ভদ্রমহিলা আত্মীয় পরিচয় দিয়ে আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলেন।

তেন্নে খালা শুরুতে কিছুদিন এতিমখানায় কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কেনেমায় অবস্থানকারী সিয়েরা লিয়ন আর্মির মেজর ফুদের গার্লফ্রেন্ড। এদেশের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করলে বিয়ে না করেই একসাথে বসবাস করতে পারে। সরকারি নীতিও এর পক্ষে বলে সমাজ বা পরিবার এতে বাধা দিতে পারে না। তেন্নে খালা মেজর ফুদের সাথে সরকারি বাসাতেই থাকতেন। আমি এতিমখানা থেকে এসে তাদের সাথে বসবাস করতে শুরু করলাম। তাদের সাথে আমার জীবনটা ভালোই কাটছিল বলা যায়। সপ্তাহখানেক পর সিয়েরা লিয়নের পূর্বাঞ্চলের দারু মিলিটারি ব্যারাকে মেজর ফুদে বদলি হয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

শিশুর গোয়েন্দাগিরি

মেজর ফুদে যখন বদলি হয়ে গেলেন তখন আমাকে আর খালাকেও তার সাথে যেতে হল। দারু মিলিটারি ব্যারাক ছিল বেশ বড় পরিসরের এবং সিয়েরা লিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম সেনানিবাস। শহরটি ছিল ছোটখাটো। এতে ঘর-বাড়ি ও বাসিন্দাও ছিল নিতান্তই হাতে গোনা। শহর ঘেঁষেই ছিল সেনানিবাস। দেড় হাজারেরও বেশি সৈনিক ও অফিসার ঐ ব্যারাকগুলোতে থাকত। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি থাকত সপরিবারে।

জীবনে যতগুলো জায়গায় থেকেছি তার মধ্যে দারু ব্যারাকে অবস্থানটাই ছিল আমার জন্য সবচেয়ে অসুবিধাজনক। ওখানকার লোকদের, এমনকি আমার বয়সের ছেলে-মেয়েদেরও, বুঝতে আমার কষ্ট হত। দৈনন্দিন জীবন ছিল পুরোপুরিভাবেই আমার বিপক্ষে। কোনো খেলার সাথী খুঁজে পাইনি বলে আমার সময় কাটত একা একা। একাকিত্বের কারণে হতাশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম যে আমি আমার আব্বা-আম্মার সাথে আনন্দে বসবাস করছি। অথচ ঘুম ভেঙে গেলেই দেখতাম চারপাশে সৈনিকদের নিয়ে আমি দারু ব্যারাকে পড়ে আছি। সেখানে আমার মানসিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে।

কয়েকদিন পর বিদ্রোহীরা দারুর কাছেই অন্য একটি ছোট শহর দখল করে নেয়। বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেয়ার জন্য মেজর ফুদের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল পাঠানো হল। প্রতি-আক্রমণে মেজর ফুদে নিহত হলেন। তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত সিয়েরা লিয়ন আর্মির (এসএলএ) প্রথম সিনিয়র অফিসার। এই ঘটনায় তেন্নে খালা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং ধীরে ধীরে তার অবস্থার অবনতি হতে থাকল। আমাদের জীবনযাত্রা আর আগের মত রইল না। যদিও তেন্নে খালা মেজর ফুদের আইনসম্মত স্ত্রী ছিলেন না তবুও মেজর ফুদের মৃত্যুর পরও তার সঙ্গীরা সহানুভূতিবশত খালাকে মিলিটারি কোয়ার্টারে থাকতে দিলেন। মাসখানেক পর দেশের ওই অংশে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচণ্ড অবনতি ঘটল। সরকার নতুন ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসার ও সৈনিকদের একটি দলকে ওখানে সেনা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাঠাল। এই দলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সহর স্যান্ডি। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের চটপটে এক সুদর্শন যুবক। একদল মানুষের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ার মত। তেন্নে খালার সাথে তার যথারীতি পরিচয় হল। আমি দেখলাম অচিরেই এই সম্পর্ক রূপান্তরিত

BanglaBook.org

হল ভালোবাসায়। তিনি হয়ে গেলেন খালার নতুন বয়ফ্রেন্ড। ক'দিন পরেই তারা একত্রে বসবাস করতে শুরু করলেন। আবার আমাদের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। এর মধ্যে একদিন বিদ্রোহীরা দারু ব্যারাক আক্রমণ করে বসল। আরও আক্রমণের আশঙ্কায় অফিসার ও সৈনিকদের পরিবারগুলোকে নিরাপত্তার কারণে ব্যারাক ছেড়ে চলে যেতে বলা হল। খালা যেদিন ব্যারাক ছেড়ে চলে যাবেন সেদিন লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি খালাকে প্রস্তাব দিলেন আমাকে তার সাথে ব্যারাকে রেখে যেতে। আমার সাথে তার খুব ভালো বনিবনা হয়ে গিয়েছিল, এমনকি খালার চেয়েও বেশি। আমার সব ব্যাপারেই তিনি খুব যত্ন নিতেন। তাই খালাও বিনা প্রতিবাদে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। তার সাথে থাকতে পেরে আমিও খুব খুশি হলাম। সৈনিকদের সাথে ব্যারাক এলাকায় খুব কম সংখ্যক ছেলেই রইল। হঠাৎ যেন ব্যারাকগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমি তো আর সৈনিক নই। তাই পুরো বিষয়টা আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিল। আমাদের আশপাশের সব প্রাণ-চাঞ্চল্য যেন হঠাৎ করে থেমে গেল। বিদ্রোহীরা এসে ঘাঁটি গেঁড়েছিল পার্শ্ববর্তী শহরেই। তারা দিন-রাত সেনানিবাসের উপর আক্রমণ চালাত। কী হচ্ছিল তা আমি বুঝতে পারতাম না এবং কী করতে হবে তা-ও আমার জানা ছিল না। দুঃখে সারাক্ষণ আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত।

দশ বছর বয়সে আমি ছিলাম দৃষ্টিনন্দন ও চোখে পড়ার মত। আমার সাথে একই বয়সী আরও কিছু ছেলে দারু ব্যারাকে ছিল। সৈনিকদের সাহায্য করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে হত। অনেকটা ফাইফরমাশ খাটার কাজের ছেলের মত। লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি এবং অন্য সৈনিকরা আমাকে দশ-বারো বছর বয়সের আরও কয়েকজন ছেলের সাথে পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থানকারী বিদ্রোহীদের মধ্যে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম এ কাজ করতে অস্বীকার করব। কিন্তু সৈনিকদের মারের ভয়ে সেকথা মুখেও আনিনি। অন্য বালকদের সাথে সৈনিকরা কী রকম দুর্ব্যবহার করে তা আমি দেখেছি। ছোটখাটো ভুল-ত্রুটির জন্যও ওরা যে রকম কঠোর ব্যবহার পায় তা দেখে আমি মনে মনে ভীত ছিলাম। তাই ওরা যা বলে আমি তা-ই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম এবং বিরোধিতা করার চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিলাম। গোয়েন্দাবৃত্তি পরিচালনার জন্য আমাদের কিছু মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হল। যেমন ধরা পড়লে কীভাবে আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে, কীভাবে একই প্রশ্নের উত্তরে বারবার একই কথা বলতে হবে, কীভাবে কারও দৃষ্টিগোচর না হয়ে শত্রুর এলাকায় উপস্থিত হতে হবে এবং কীভাবে রিপোর্ট দেবার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ইত্যাদি অনেক কিছুই আমাদের শেখানো হল। আমার মধ্যে ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও আমিই সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চালাক চতুর প্রমাণিত হলাম।

BanglaBook.org

প্রথম মিশনে আমাদের ভান করতে হয়েছিল যে, আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কমলা কুড়িয়ে আনতে যাচ্ছি। ওই সময় বিদ্রোহীরা ছোট ছোট শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন ছিল না। আমাকে একজন বিদ্রোহী জিজ্ঞাসাবাদ করল। তার ভাষায় ছিল লাইবেরিয়ার কথার টান। কীভাবে শত্রুকে ধোঁকা দিতে হবে সেই মৌলিক প্রশিক্ষণ আমি এর মধ্যেই শেষ করেছিলাম। তাই খুব সহজেই আমি তাকে বানিয়ে বললাম যে, আমি ফ্রি-টাউনের বাসিন্দা এবং বর্তমানে পাশের গ্রামেই আমার দাদির সাথে থাকি। আমি বললাম প্রায়ই বন্ধুদের সাথে আমি কমলা কুড়াতে যাই এবং আজও যাচ্ছি। লোকটা আমার সাথে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে কথা বলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আমার সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করতে শুরু করল। এমনকি সে আমাকে কমলা কুড়াতে সাহায্যও করল এবং বলে দিল আমি যেন রোজই তার সাথে এসে দেখা করি। আমরা ব্যারাকে ফিরে এই গল্প লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি ও অন্যদের বললাম। এটাকেই আমাদের সফল অপারেশন হিসেবে গণ্য করা হল। আমি এর পর থেকে হররোজ গোয়েন্দাবৃত্তির কাজে যেতে শুরু করলাম। সৈনিকরা কাঁধে করে আমাকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এমনভাবে নিয়ে যেত যেন আমার ব্যারাকের দিক থেকে আসাটা কারও নজরে না পড়ে। এসময় ওই এলাকায় ক্যাম্প করা অধিকাংশ বিদ্রোহীর সাথে আমি পরিচিত হয়ে গেলাম। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা আমার উপর আস্থা রেখে আমাকে বলতে শুরু করল আমি যেন সেনা ব্যারাকে গিয়ে তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করি। এটা তাদের কোনো আদেশ নয় বরং অনুরোধ ছিল মাত্র। সৈনিকরা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল ঠিক সেভাবেই আমি বিদ্রোহীদের বলেছিলাম, সৈন্যদের ব্যারাকে যেতে আমার ভয় হয় কারণ আমি শুনেছি ওরা ছোটদেরকে ভীষণ মারধর করে। এ কথা শুনে বিদ্রোহীরা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, ইংরেজিতে ভালো কথাবার্তা বলতে পারি বলে আমাকে কেউ মারধর করবে না। বিদ্রোহীরা বলেছিল অন্য বালকদের সাথে আমি যে সেই গ্রামে যাতায়াত করি তা যেন সৈনিকদের কাছে না বলি।

আমি ফিরে এসে লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি ও অন্যদের পুরো কাহিনীটা বললাম। ওরা আমাকে এই বলে ভয় দেখাল যে, বিদ্রোহীদের সাথে আমি যা যা আলাপ করেছি তা সবই তাদের কানে আসবে এবং যা বলতে নিষেধ তা যদি আমি বলে থাকি তা হলে আমাকে হত্যা করা হবে। এইভাবে কাজ করতে করতে আমি একজন ভালো গোয়েন্দা হয়ে গেলাম। বিদ্রোহীদেরকে বলার জন্য আমাকে প্রতারণামূলক কাহিনী শিখিয়ে দেয়া হত। সৈনিকদের সম্পর্কে এসব কাহিনী ছিল বিদ্রোহীদের জন্য চরম আগ্রহের। এই কারণেই আমি যা বলি বিদ্রোহীরা তা বিশ্বাস করতে শুরু করল। আমি হয়ে গেলাম একজন দক্ষ গোয়েন্দা।

BanglaBook.org

এদিকে আমরা যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলাম তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবহার শেখানোর কার্যক্রম শুরু হল। সৈনিকরা যা করতে বলে তা আমি বাধ্যগত সৈনিকের মত করতে থাকলাম। আমার সমগ্র জীবন বদলে যেতে শুরু করল। শত্রু-মিত্র, যুদ্ধ, রণকৌশল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে শুরু করলাম। সৈনিকরা আমার মন জয় করার জন্য আমার অতীত বিপর্যয়গুলোকে ব্যবহার করল। যেমন ওরা আমাকে এই আশ্বাস দিল যে, আমার আব্বা-আম্মার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই আমাকে সৈনিক হতে হবে। ওরা আমাকে এই আশাও দিল যে, যুদ্ধের পর আমাকে আবার স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে। লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির দেয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য সুযোগের কারণেই আমি হয়ে গেলাম বালকদের মধ্যে সবচেয়ে অনুগত। আমি যা কিছু করেছি তা একটি মাত্র চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা নিয়েই যে আমি একদিন স্কুলে ফিরে যেতে পারব।

প্রশিক্ষণের সময় আমাদের দুটি দলে বিভক্ত করা হয়েছিল। একটি দল গোয়েন্দা কার্যে এবং অন্য দল সৈনিক হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। আমি ছিলাম গোয়েন্দাদের দলে। আমার দলে আমরা মোট সাতজন বালক ছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম অত্যন্ত চালাক-চতুর এবং সেনাবাহিনীর প্রয়োজনেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। ফলে এই গ্রুপটাই খাতির-যত্ন বেশি পেত। সেনাবাহিনীতে একটি অলিখিত নিয়ম আছে যে, গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে সামরিক লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থেই কখনও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে দেয়া হয় না। কারণ সকল কাজই তাদের অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সম্পন্ন করতে হয়। এছাড়াও বেসামরিক লোকজন ও শত্রুপক্ষ উভয়ের কাছেই তাদের ব্যবহার এবং চালচলন হতে হয় সন্দেহাতীতভাবে স্বাভাবিক। তবে আমাদের অপ্রাপ্তবয়স্কদের যে দলকে সৈন্যবৃত্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল সাধারণত তাদের ব্যবহার করা হত যুদ্ধের টোপ হিসেবে এবং তাদের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও মদ পান করতে দেয়া হত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জীবনের প্রথম যুদ্ধ ও সংঘর্ষ

এক পর্যায়ে আমাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে গেল। আমি যেন হয়ে গেলাম একজন পুরোদস্তুর সৈনিক। ফলে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে আরইউএফের দখল থেকে পেনদেমবু শহর উদ্ধারের জন্য সৈন্যদের যে ব্যাটালিয়ন পাঠানো হয় আমি ছিলাম তাদের সহগামী চাইল্ড সোলজারদের অন্যতম। সৈনিকদের মত আমাকেও অস্ত্র ও সরঞ্জাম ইস্যু করা হল। আমাকে দেয়া একে-৪৭ অস্ত্রটি যথেষ্ট ভারি ও বড় হওয়ায় তা আমার পক্ষে বহন করা কষ্টকর ছিল। ফলে হাতিয়ার বদল করে আমাকে একটি পিস্তল দেয়া হল। তবে আমার অনেক বন্ধুকেই কষ্ট করে একে-৪৭ বহন করতে হয়েছে। দারু মিলিটারি ব্যারাক থেকে পেনদেমবুর দূরত্ব ছিল ২৭ কিলোমিটার এবং এই দীর্ঘপথ আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল। এই হাঁটার কাজটাই আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন ছিল। আমি ছিলাম একটু মোটা এবং সৈনিকরাও জানত এতটা পথ আমার পক্ষে হেঁটে যাওয়া মুশকিল। তাই যখনই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম সৈনিকরা পালাক্রমে আমাকে তাদের পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেত। বিদ্রোহীদের অ্যাম্বুশ এড়ানোর জন্য প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ দূরত্ব জঙ্গলের মধ্য দিয়েই আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল। আমাকে যারা পিঠে তুলে নিয়েছিল তাদের জন্য আমি ছিলাম সত্যিই একটি বোঝা। আমার সমবয়সী বা এক-দুই বছরের বড় যেসব চাইল্ড সোলজার ছিল তাদের জন্যও এই দূরত্ব হেঁটে অতিক্রম করা ছিল কষ্টকর। কিন্তু যখনই তারা এ বিষয়ে অভিযোগ করত সৈন্যরা তাদেরকে নির্দয়ভাবে মারধর করত। অবস্থা দেখে আমি শিউরে উঠতাম। এমন হৃদয়হীন পরিবেশ আমি আগে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।

পেনদেমবু শহরের আধা কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছানোর পর আমাদেরকে ডেপ্লয় বা মোতায়েন করা হল। আমাকে বেসামরিক পোশাক পরিয়ে দুজন চাইল্ড সোলজারের সাথে মোতায়েন করা হল পার্শ্ববর্তী গ্রামে। আমাদের কাজ ছিল বিদ্রোহীরা কীভাবে শহরের ভিতর প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে নিজেদের বিন্যস্ত করেছে তা দূর থেকে লক্ষ করে বুঝে নেয়া এবং জেনে নেয়া তারা কী কী ধরনের হাতিয়ার ও গোলাবারুদ ব্যবহার করছে। আক্রমণের পূর্বেই সৈনিকদের জন্য এসব তথ্য ছিল অত্যন্ত জরুরি বিষয়। পেনদেমবু শহরে তখন পাঁচ শতাধিক অধিবাসী এবং এক হাজারের বেশি আরইউএফ বিদ্রোহী অবস্থান করছিল।

BanglaBook.org

শহরটি ছিল আরইউএফের সদর দফতর। সবার সন্দেহ এড়িয়ে পুরো শহরটি পর্যবেক্ষণ করতে আমাদের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এই কাজে আমরা সফল হয়েছিলাম। আমরা জঙ্গলে ফিরে গেলাম এবং যা যা দেখছি তা সবই সৈনিকদের কাছে ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করলাম। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই অতি দ্রুত শহরটির উপর আক্রমণ করা হল। দীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ হল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা বিজয়ী হলাম। এই যুদ্ধে অনেক লোকের, এমনকি আমাদের কিছু সৈনিকেরও, প্রাণহানি হল। চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো মৃতদেহের দৃশ্যটা আমার কাছে ছিল হৃদয় বিদারক। আমার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল! অথচ আমি দেখলাম আমার চতুর্দিকে সৈনিকরা বিজয়ের আনন্দে উল্লাস করছে ও গান গাইছে। এটা তাদের বিজয়ের আনন্দ! আশেপাশে রক্তাক্ত লাশ নিয়ে এভাবে উল্লাস করতে হয়তো সৈনিকরাই কেবল পারে। আমার কাছে সবকিছু দুঃস্বপ্নের মত মনে হল।

ওদিকে এত বড় ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয় আরইউএফ ভুলে যায়নি। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠল। সিয়েরা লিয়ন আর্মির সদস্যরা ভাবতেই পারেনি যে ওরা এত কম সময়ের মধ্যে আক্রমণের শক্তি অর্জন করে ফিরে আসতে পারেব। মাত্র পাঁচ দিন পর বিদ্রোহীরা নিকটবর্তী একটি গ্রামে পুনর্গঠিত হল এবং ভোররাত তিনটায় শহরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। ভোর ছ'টার মধ্যেই তারা আমাদের সৈন্যদের পরাজয় নিশ্চিত করল। বিদ্রোহীদের ফায়ারিং থেকে সৈনিকদের ফায়ারিংকে আমি পৃথক করতে পারছিলাম না। এ ধরনের এলোপাতাড়ি ফায়ারিং দারু ব্যারাকে প্রায়ই হত। তাই আমার মনে হয়েছিল সে ধরনেরই কোনো ব্যাপার হয়তো ঘটে থাকবে। ফলে আমি বিছানাতেই শুয়ে ছিলাম। কিন্তু আমি জানতে পারিনি যে এর মধ্যেই সৈনিকরা অবস্থান ছেড়ে দিতে শুরু করেছিল। এক সময় ওরা আমাকে একা ফেলেই চলে গেল। সকালের আলোতে আমি পরিচিত কাউকে দেখতে পেলাম না। পরিচিত মুখ খুঁজতে গিয়ে চারদিকে অসংখ্য মৃতদেহই কেবল দেখতে পেলাম। অধিকাংশ মৃতদেহই আমাদের সৈনিকদের ছিল না। বলা যায় যে সিয়েরা লিয়নের গৃহযুদ্ধের ওই পর্যায়ে বিদ্রোহীরা অপ্রাপ্তবয়স্ক সৈনিক বা চাইল্ড সোলজারদের ব্যাপারে ততটা সচেতন ছিল না। তবু আমি যে একজন আগন্তুক তা আঁচ সহজেই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। কয়েকজন বিদ্রোহী আমাকে জেরা করতে শুরু করল। সিয়েরা লিয়নের প্রধান তিনটি ভাষা ক্রিওল, তিমনি ও মেন্ডে কোনোটাই ভালোভাবে আমার আয়ত্তে ছিল না। গ্রাম্য ভাষাগুলো তো নয়ই। ইংরেজিই ছিল আমার জন্য সবচেয়ে সহজ ভাষা। আমি যেহেতু বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলছিলাম তাই তারা জানতে চাইল আমি কোন গ্রাম থেকে এসেছি। শহরের

BanglaBook.org

আশেপাশের কোনো গ্রামের নাম আমার জানা ছিল না। তাই আমি উত্তর না দিয়ে কেবল কাঁদতে থাকলাম।

সন্ধ্যার আগেই তাদের নেতা ফুদে সাঙ্কো এলেন। বিদ্রোহীদের দলনেতা আমাকে তার কাছে নিয়ে গেল এবং জানাল যে, আমাকে শহরের মধ্যে পাওয়া গেছে এবং আমি সারাক্ষণ কান্না করছি। তিনিও আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আমার আসল কাহিনী তাদের জানাতে আমি তখনও ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি ও অন্যরা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল যেন আমি বিদ্রোহীদের কোনো কিছু না বলি, বললে আমাকে হত্যা করা হবে। আমি কান্না থামালাম না। তখন ফুদে সাঙ্কো আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি তার নাম শুনেছি কি না? তিনি স্নেহসুলভ কণ্ঠে আমার সাথে গল্প করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, একসময় তিনিও সরকারি সৈনিক ছিলেন কিন্তু বর্তমানে জনগণের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন আমি যেন সব কথা বলি এবং নিশ্চয়তা দিলেন যে কেউ আমার কোনো ক্ষতি করবে না। আমি তখনও কান্না থামালাম না। অবশেষে অনেক বলা-কওয়ার পর আমি কান্না বন্ধ করলাম এবং আমার কোনো কিছু না বলার কারণ তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। আমার জীবনের শুরু থেকে ঘটে যাওয়া সবগুলো কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলাম। আমার কাহিনী শুনে তারা সকলেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লেন। ফুদে সাঙ্কো বললেন, তিনি বিশ্বাস করেন আমি আফ্রিকার বাইরেই বড় হয়েছি এবং আরও বললেন ওই সময় থেকে যেন আমি তাকেই আমার পিতা হিসেবে গণ্য করি। আমার জীবন রক্ষার জন্য এবং আমার স্কুলজীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য সম্ভব সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি তিনি আমাকে দিলেন। আমার মনে পড়ল এরকম প্রতিশ্রুতি লেফটেন্যান্ট স্যান্ডিও আমাকে দিয়েছিলেন। তবুও তার আশ্বাসে আমি খানিকটা চিন্তামুক্ত হলাম।

তিনি তখন আমাকে দারুর সৈনিকদের সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আমি তখনও সরাসরি কিছু বলতে ভয় পাচ্ছিলাম কারণ আমার মনে হচ্ছিল আমি যা বলব তা সৈনিকরা জেনে যাবে। তাই অল্প কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরেই আমার আর বলার কিছু থাকল না। পরে তিনি আমাকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। পরদিন তিনি ক্যাম্পের সকল বিদ্রোহী ও গ্রামবাসীকে একত্রিত করলেন। সেখানে আমাকে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, প্রেসিডেন্ট মোমোর সরকার আমাকে একজন সৈনিক হিসেবে আরইউএফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বিষয়টা সকলের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঠেকেছিল শুধু এই কথা ভেবে যে, আমার বয়সের বালকও সৈনিক হতে পারে! ফলে তারা আমাকে 'পেকিন সৈনিক' বলে ডাকতে শুরু করল। তিমনি ভাষায়

BanglaBook.org

পেকিন অর্থ শিশু বা চাইল্ড। মিটিং শেষ হলে শহরের প্রত্যেকেই আমাকে 'পেকিন সৈনিক' বা চাইল্ড সোলজার হিসেবে সম্বোধন করতে থাকল। ফুদে সাঙ্কো আমাকে বললেন আমি যেন তাকে 'পোপে' বলে সম্বোধন করি। পোপে অর্থ হল পিতা। এরপর আমি তার সাথে থাকতে শুরু করলাম। খাওয়া এবং ঘুমানো থেকে শুরু করে সব কিছুই আমরা একসাথে করতে থাকলাম। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল যে, তিনি আমার সত্যিকারে পিতা! বাহিনীপ্রধানের সন্তান হিসেবে আরইউএফের সকল সদস্যই আমাকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিতে শুরু করল। কয়েক সপ্তাহ পর তিনি লাইবেরিয়ায় গেলেন এবং সপ্তাহখানেক পর ফিরে এলেন। ফেরার সময় আমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে এলেন। আমাকে খুশি করার জন্য এবং তাদের সাথে সম্পর্ক সহজ করার জন্য সাঙ্কো ও তার লোকেরা সম্ভব সবকিছু করলেন।

এদিকে লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি ও দারুর পরিবেশের কথা আমার মনে পড়ছিল বারবার। দারুর পরিবেশ ছিল পেনদেমবুর তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত। তাই এখানে আমার ভালো লাগছিল না। কিন্তু আমি কীভাবে ওদের দলে ফিরে যাব তাও ভেবে পাচ্ছিলাম না! ভাবতে ভাবতে আমি মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। ১৯৯২ সালের প্রথম দিকে একজন ব্যবসায়ীকে আরইউএফ পেনদেমবুতে আটক করে রেখেছিল। ওই লোক সৈন্যদের কাছে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করত বলে তারা সন্দেহ করেছিল। বন্দি হওয়ার আগে এই লোকটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে সরকারি বাহিনী অধিকৃত এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য ও সিগারেট এনে এখানে বিদ্রোহীদের কাছে বিক্রি করত। সেই সময় আমি ছিলাম তার বাঁধা খদ্দের। যখনই কাছে পেতাম আমি তাকে দারুর সৈন্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। পরবর্তীতে বন্দি হওয়ার পর আমি তাকে দেখতে যেতাম এবং তার জন্য খাবার নিয়ে যেতাম। তিনি বন্দি হলেও তাকে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল খুবই ঢিলেঢালা। সেই সুযোগে একদিন আমি তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে দারুতে পালিয়ে যেতে রাজি আছেন কি না তা সরাসরি জানতে চাইলাম। তিনি সম্মত হলেন। আমরা পরিকল্পনা করা শুরু করলাম। ফুদে সাঙ্কো কোথায় টাকা-পয়সা রাখে তা আমি জানি কি না তিনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, ওটা আমার জানা আছে এবং তা আমার নাগালের মধ্যেই। তিনি বললেন কিছু টাকা-পয়সা সাথে নিলে আমাদের পালানোটা সহজ হবে। গ্রামের লোক ভাড়া করে তাদের পিঠে করে আমাকে বয়ে নেয়ার জন্যই এই টাকা খরচ করা হবে।

পেনদেমবুর আরইউএফ ক্যাম্পে প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটত যে সরকারি সৈন্যদের বিভিন্ন অবস্থানে আক্রমণের উদ্দেশ্যে অপারেশন পরিচালনার জন্য

BanglaBook.org

বিদ্রোহীদের অধিকাংশ সদস্যই দুয়েক দিনের জন্য একসাথে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেত। আমরা কয়েকজনকে বাদ দিলে পুরো ক্যাম্পটা খালিই পড়ে থাকত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দিনের বেলায় পালানোটাই ছিল সহজ। মাঝ মাসের কোনো এক সকালে অধিকাংশ বিদ্রোহী তাদের মিশনে চলে গেল। ফুদে সাঙ্কো ক্যাম্পেই ছিলেন এবং অধীনস্থ কয়েকজন কমান্ডারের সাথে মিটিং করছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রুমে গেলাম এবং কিছু টাকা পকেটে ভরে নিলাম। ক্যামেরার সবগুলি ফিল্ম, ফুদে সাঙ্কো এবং অন্যান্য বিদ্রোহীর সাথে তোলা আমার সব ক'টি ছবি এবং আরও কিছু জরুরি দলিলপত্র সাথে নিয়ে নিলাম। এইসব জিনিস আমি ব্যবসায়ী লোকটির কাছে দিয়ে দিলাম। এরপর আমরা দুজন অত্যন্ত শান্তভাবে হাঁটতে থাকলাম, যেন আমরা শহর এলাকায় পায়চারি করছি মাত্র। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। একটি গ্রামে পৌঁছে ব্যবসায়ী লোকটি গ্রামের দুজন লোককে ভাড়া করলেন আমাকে বহন করার জন্য। কারণ আগেই বলেছি যে আমি ছিলাম বেশ মোটাসোটা এবং দীর্ঘ পথ পাঁয়ে হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস আমার ছিল না।

মানুষের নজর এড়িয়ে জঙ্গলের পথ ধরে দারু পৌঁছতে আমাদের প্রায় পাঁচ দিন সময় লেগে গেল। এখানে এসে আমি পরিচিত কয়েকজন সৈনিকের দেখা পেলাম। তারা ভেবেছিল বিদ্রোহীরা এর মধ্যেই আমাকে মেরে ফেলেছে। ওদের কাছে জানলাম লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি আর দারুতে নেই, তিনি বদলি হয়ে ইয়ামাতে চলে গেছেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ফুদে সাঙ্কোর নিকট থেকে নিয়ে আসা ফিল্ম এবং দলিলপত্র নিয়ে আমি সেখানেই যাব। কয়েকদিন পর আমি তার কাছে পৌঁছলাম এবং ফুদে সাঙ্কোর নিকট থেকে নিয়ে আসা সব জিনিস তার হাতে তুলে দিলাম। দলিলপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখার পর তিনি আমাকে কেনেমায় ব্রিগেড সদর দফতরে নিয়ে গেলেন এবং সবগুলো ফিল্মকে ডেভেলপ করালেন। এর পর তিনি আমাকে লে. কর্নেল ইয়াহিয়া কানুর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার কাছে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন। কীভাবে আমার সাথে তার যোগাযোগ ঘটেছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে আমি কীভাবে তাদের বাহিনীকে সাহায্য করেছি ইত্যাদি সবই জানালেন। কর্নেল কানু তক্ষুনি আমাদের নিয়ে ফ্রি-টাউনে রওনা হলেন এবং সেখানে সেনাবাহিনীর সদর দফতরে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান লে. কর্নেল সিম তুরের কাছে আমার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেন। ফুদে সাঙ্কোর কাছ থেকে নিয়ে আসা সবগুলো ছবি ও দলিলপত্র তিনি তাকে দেখালেন। কর্নেল তুরে অত্যন্ত সাবধানে সবগুলো কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখলেন। এরপর তিনি আমাদেরকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জোসেফ সাইদু মোমোর কাছে নিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

আমার সমস্ত কাহিনী ও কর্মকাণ্ডের কথা তাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে শোনানো হল। পরদিনই রাষ্ট্রীয় ভবনে সকল সরকারি কর্মকর্তা এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক ও পুলিশ অফিসারদের নিয়ে এক উচ্চ-পর্যায়ের মিটিং ডাকা হল। ওখানে আমাকে বলা হল আমি যেন আরইউএফের সাথে আমার সকল অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করি। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না। শেষে লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি আমাকে এসে বুঝালেন যে, আমি যেন ইয়ামাতে তাকে বলা সম্পূর্ণ কাহিনী অবিকলভাবে পুনরায় এখানে শোনাই।

এমন উচ্চ পর্যায়ের সভায় কথা বলাটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার ছিল না। যা হোক আমি আমার বিবৃতি শুরু করলাম। আমি যখনই কোনো অংশ বাদ দিয়ে যেতাম লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি আমাকে তৎক্ষণাৎ তা মনে করিয়ে দিতেন। নিঃশব্দ নীরবতার মধ্যে সকলে আমার কথা শুনলেন এবং কেউ কেউ প্রয়োজনীয় নোট নিলেন। আমার কথা শেষ হলে এসএলএ'র চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ আমার আনা সবগুলো ছবি এবং দলিলপত্র ঘটনার প্রমাণ হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পেশ করলেন। ছবিগুলো হাতে হাতে সারা ঘর ঘুরে এল। পরে প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখলেন এবং বললেন, 'এই সাক্ষাৎকার হল সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে আমাদের সরকারের প্রতি এক প্রকার গোপন মদদ। একজন হতভাগ্য বালক আমাদের এতবড় উপকার করেছ যে আমরা কখনও এর শোধ দিতে পারব না।' তিনি পরে সাংবাদিকদের এই কাহিনী কোনোভাবেই প্রকাশ না করতে বলে দিলেন কারণ এতে মিলিটারি অপারেশনকে হেয় করা হবে এবং আমার জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে। তিনি আরও বললেন যে, আর্মির একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল হিসেবে আমার মত বালকদের সামরিক কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়ার উপকারিতার কথা তার জানা আছে এবং এই বিষয়টাকে গোপন রাখতে হবে যাতে অন্য কোনো বালকের জীবন বিপন্ন হয়ে না পড়ে। আমাকে নিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা জানতে চাইলেন। প্রেসিডেন্ট মোমো বললেন, সামরিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার মত বালকদের সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যবহার করাটা তার সরকার কোনো মতেই সমর্থন করতে পারবে না। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, তার সরকার এবং তিনি নিজে আমার লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল কিছু করবেন। একথা শুনে উপস্থিত সকলেই হাততালি দিয়ে গভীর আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর প্রধান বিচারপতি ডক্টর আব্দুলাই কোনটে দাঁড়ালেন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্যে আরও মসৃণতা আরোপ করে বললেন, শিশু অধিকার সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশনে সিয়েরা লিয়নও অন্যতম স্বাক্ষরদাতা রাষ্ট্র। এই কনভেনশনের স্পষ্ট নীতিমালার নিরিখে আমার অভিজ্ঞতার বিবৃতি সত্যি বিব্রতকর ও অত্যন্ত

BanglaBook.org

পীড়াদায়ক। তিনি জোর দিয়ে বললেন, এ ধরনের ঘটনা যে কোনো শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে এবং তার সিয়েরা লিয়নি ভাইদের দুঃখজনক মৃত্যুর কথা বিবেচনা করে তিনিও আমাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্ভাব্য সব কিছু করবেন। এছাড়া সেদিনকার সেই কনফারেন্সে আরও অনেকেই অনেক ভালো ভালো কথা বললেন এবং আমার ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা সম্বলিত অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাননীয় প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট স্যান্ডিকে আমার জন্য কিছু টাকা দিলেন এবং আমার নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সমাজসেবা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিলেন। বলা হল পরের সপ্তাহ থেকেই আমার স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এভাবেই সেদিনের মিটিং শেষ হল।

এই মিটিংয়ের পর লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্রি-টাউনে এসে স্কুলে যাওয়া শুরু করার আগে আমার উচিত হবে ইয়ামাতে গিয়ে অন্য সৈনিকদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আসা। আমি একজন বালক মাত্র। সুতরাং তিনি যা বললেন তার ব্যতিক্রম করার কোনো উপায় আমার ছিল না। আমরা ইয়ামাতে ফিরে গেলাম। ওই সময় সেখানকার সেনা ছাউনিতে এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির সকল সহকর্মী ও অন্য সৈন্যরা সরকারের বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগ নিয়ে তার কাছে হাজির হল। ওই ছাউনির জুনিয়র অফিসারদের গ্রুপটিতে তিনিই ছিলেন অপেক্ষাকৃত সিনিয়র। তাছাড়া ওখানকার প্রায় সকলেই বিশ্বাস করত যে প্রেসিডেন্ট মোমোর এপিসি সরকারের উপর লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কারণ প্রেসিডেন্ট মোমোর ডান হাত এবং সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান লে. কর্নেল তুরে ছিলেন লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির সৎ-পিতা। সৈনিকরা ধরে নিয়েছিল যে, সরকারের কাছে তাদের অভিযোগ পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। অভিযোগগুলো ছিল বেতন প্রদানে বিলম্ব, খাবার ও ওষুধের অপর্যাপ্ততা এবং সঠিক সামরিক পোশাকের অভাব সম্পর্কিত। সে সময় এপিসি দলের দীর্ঘ দুঃশাসনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। অন্যদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় ডায়মন্ড খনিগুলো বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছিল। অথচ সরকারি আয়ের শতকরা ষাট ভাগ আসত ডায়মন্ড থেকে। তাছাড়া বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য হঠাৎ করেই সরকারকে এসএলএ'র সৈন্যসংখ্যা অনেক বাড়াতে হল। কিন্তু ভালো বেতন দেয়ার ক্ষমতা সরকারের ছিল না। মানুষের হাতে অর্থ ছিল না বলে যুবকেরা বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ওদিকে আবার আধুনিক অস্ত্রের যোগান দিতে সরকার ব্যর্থ হচ্ছিল। ফলে অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বিদ্রোহীদের দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছিল সরকারি বাহিনী। ফলে অফিসার ও সৈনিক নির্বিশেষে সেনাবাহিনীর সকলের মধ্যেই হতাশা দেখা দিয়েছিল। বিশেষত

BanglaBook.org

শিশুর হাতে হাতিয়ার তুলে দেয় সিয়েরা লিয়নের সরকারি ও বিদ্রোহী বাহিনী উভয়েই

জুনিয়র অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের সারা বছরই যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকতে হত। তাই তারাই ছিল এই হতাশার মূল শিকার। সৈনিকদের মাসিক বেতন ছিল অত্যন্ত কম, মাত্র ৩ হাজার লিয়ন বা সাড়ে ৪ ডলারের সমপরিমাণ। সেটাও বকেয়া পড়ে ছিল অনেক দিন ধরে। লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি এইসব অভিযোগের ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং তিনি সরকারের কাছে এইসব অভিযোগ পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে সকল প্রকার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। দুঃখজনকভাবে ১৯৯২ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে সৈনিকদের এইসব দাবির বিষয়ে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সেনা অভ্যুত্থানে জড়িয়ে পড়া

১৯৯২ সালের ২৫শে এপ্রিলের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে লেফটেন্যান্ট ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কের কিছু অফিসার এবং তাদের অধীনস্থ সৈনিকরা সিয়েরা লিয়নের পূর্বাঞ্চলীয় শহর ইয়ামাতে একটি মিটিং করে। এই মিটিং ছিল তাদের পূর্বের দাবিদাওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যে বিষয়ে আগেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, তারা সকলে একযোগে রাজধানী ফ্রি-টাউনে যাবে এবং সরকারকে সরাসরি তাদের দাবিদাওয়া জানিয়ে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হবে। আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই কাজটি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াহিয়া কানুর অগোচরেই করা হবে যিনি কেনেমাতে অবস্থান করছিলেন। লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি সভার এই প্রস্তাবে রাজি হন। ২৮শে এপ্রিল দুই শতাধিক সৈনিক এবং চারজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইয়ামা থেকে ফ্রি-টাউনে সভা করার জন্য যাত্রা করেন। যদিও আমি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সিয়েরা লিয়ন সেনাবাহিনীর তালিকাভুক্ত সৈনিক নই তথাপি আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা এবং লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে আমিও এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম।

ফ্রি-টাউন যাওয়ার পথে কেনেমাতে একদল সৈনিক আমাদের বাধা দেয় কিন্তু লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির দেয়া প্রাণবন্ত ও উদ্দীপক ব্যাখ্যা শোনার পর এই সকল সৈন্যও আমাদের সাথে যোগ দেয়। ব্যাঙ্গুয়েমা ট্রেনিং সেন্টারের নিকটে পুনরায় আমাদের পথরোধ করা হয়। এটি হল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মিলিটারি ব্যারাক এবং এখান থেকেই রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ শুরু হয়। এখানে আবার লেফটেন্যাট স্যান্ডিকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হয়। তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বাধা প্রদানকারী অধিকাংশ সৈনিক আমাদের দলের সাথে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই রাত আমরা ব্যাঙ্গুয়েমাতে কাটাই। সারা রাত ধরে অনেক ধরনের পরিকল্পনা করা হয়। এই অপারেশনে ব্যবহারের জন্য ডেপো থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে গাড়ি ভর্তি করা হল। সে রাতেই কয়েকজন সৈনিককে এই অপারেশন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ফ্রি-টাউনের ব্যারাকগুলোতে পাঠানো হয়, যাতে পরদিন যে কোনো সম্ভাব্য আক্রমণ বা সংঘর্ষ এড়ানো যায়। ২৯ এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় আমরা ফ্রি-টাউনে এসে পৌঁছলাম। উত্তেজনার এক পর্যায়ে সৈন্যরা আকাশে গুলি ছুড়তে এবং সবাই মিলে আনন্দে কোরাস গাইতে শুরু

BanglaBook.org

করল। এ ধরনের গোলাগুলি দেখে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আমি একটি টয়োটা হাইলাক্স গাড়ির মধ্যে লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি ও ড্রাইভারের মাঝখানে বসে ছিলাম। শহরের মধ্যে খুব বেশি ফায়ারিং হচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট মোমোর তৎকালীন সরকার পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে তার অধীনস্থ স্পেশাল সিকিউরিটি ডিভিশনের (এসএসডি) মাধ্যমে সৈন্যদের উপর আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এসএসডির লোকজন এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ নির্দেশ মেনে না নিয়ে বরং সৈনিকদের পক্ষেই যোগ দেয়। সকাল দশটার আগেই প্রেসিডেন্ট মোমো রেডিওতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং দাবি করলেন যে, পুরো পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনা হয়েছে এবং সকল দোষী ব্যক্তিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের মাধ্যমে বন্দি করা হবে। তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত হতে নিষেধ করলেন এবং নিশ্চয়তা দিলেন যে তিনি এখনও দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

তার ভাষণের পরপরই লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি এবং তার সহকর্মীরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সিনিয়র অফিসারের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সকল সিনিয়র অফিসারের অনেককে তাদের জুনিয়ররা সামরিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বন্দি করে রেখেছিল। সহকর্মী এবং সিনিয়র অফিসারদের সাথে সকল প্রকার আলাপ-আলোচনায় লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির সাথে সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কিছু সিনিয়র অফিসার এই বলে উপদেশ দিলেন যে লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি ও তার দলের কার্যাবলিকে সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। এখন যদি তারা ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের সকলকে বন্দি করা হবে। যদি তাদের একবার বন্দি করা হয় তাহলে দেশদ্রোহিতার অপরাধে কোর্ট মার্শালে সকলের বিচার হবে, সেনা-আইনে যার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড! সুতরাং তাদের উচিত নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই প্রেসিডেন্ট মোমোর এপিসি (অল পার্টি কংগ্রেস) সরকারকে উৎখাত করা। দুপুর নাগাদ রাজধানীর সকল সৈন্যের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে এটি একটি 'ক্যু-দে-তাঁ' বা সামরিক অভ্যুত্থান। ফলে বাকি সৈনিকদের সকলেই মহানন্দে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এই দলের সাথে এসে যোগ দিল। লেফটেন্যাট স্যান্ডির নেতৃত্বে সংগঠিত এই দুঃসাহসী কাজ ধীরে ধীরে একটি সামরিক সরকার গঠনের পথে অগ্রসর হল। এতবড় কাজের জন্য তাদের কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। আসলে তা আবেগের বশবর্তী হয়ে সামান্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেশের সরকার পরিবর্তনের মত মারাত্মক কাজে জড়িয়ে পড়েছে তারা! এখন অবস্থা এমন যে রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য নতুন সরকার গঠন করতে হবে। সুতরাং

pathagar.org

তখন প্রশ্ন দেখা দিল, কে এই সরকারের প্রধান হবেন? অন্য অফিসাররা লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির নাম প্রস্তাব করলেও তিনি নিজেকে এই পদের জন্য অত্যন্ত তরুণ এবং অনভিজ্ঞ মনে করলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি সেনাবাহিনীতে সবে মাত্র তিন বছর সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি তার সহকর্মীদের কাছে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এবং তার সৎ-পিতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম তুরের নাম প্রস্তাব করলেন। অভ্যুত্থানকারী অফিসাররাও নিজেদের অনভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে তাকেই সরকারপ্রধান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

কর্নেল তুরে ছিলেন একজন অত্যন্ত সচেতন ও পেশাদার অফিসার। আবার তিনি ছিলেন এপিসি সরকারের গোঁড়া সমর্থক। এই সরকারকে যারা উৎখাত করতে চাইবে তাদের সাথে তিনি কোনো প্রকার আপোস করতে রাজি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিদ্রোহী অফিসারদের এ কথা জানা ছিল না। দুপুর একটা নাগাদ কর্নেল তুরের সাথে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য যাওয়া লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির নেতৃত্বাধীন সৈন্যদলে আমিও ছিলাম। কর্নেল তুরে তার কিছু অনুগত সৈনিকসহ গোলাবারুদের ভাণ্ডার এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন। লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। পরে আমরা তার কাছে গেলাম এবং লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি পুরো ঘটনার ব্যাপারে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। একজন জুনিয়র অফিসারের মুখে এ ধরনের ব্যাখ্যা শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাই তিনি লেফটেন্যান্ট স্যান্ডিকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রতিবাদে লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি ঘোষণা করলেন যে তিনি (লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি) তাকে (কর্নেল তুরে) বন্দি করছেন! এ কথা শুনে কর্নেল তুরে রাগে চিৎকার করে বললেন, 'বন্দি করছ!' এবং লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি বুঝে ওঠার আগেই তার উপর গুলি করলেন। লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি নিহত হলেন। এই ঘটনার পরপরই সমস্ত এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। সৃষ্টিকর্তার দয়ায় কেবল আমরা দুজন প্রাণে বেঁচে গেলাম। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার এবং আমিই শুধু ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলাম। লেফটেন্যান্ট স্যান্ডিসহ ওই দলের অন্য সকলে ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন। আমরা এসে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এসএজে মুসার সাথে যোগ দিলাম। তিনি ছিলেন এই অপারেশনের উপ-দলনেতা বা সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তিনি কিছু সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল তুরের খোঁজে বের হলেন কিন্তু তাকে কোথাও না পেয়ে ফিরে এলেন।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ডির মৃত্যুতে পুরো অপারেশনটাই যেন একটুখানি পিছিয়ে গেল। নতুন সরকারের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন তা তখনও নির্ধারণ করা হয়নি। বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচনা করে নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ভি ই এম এসট্রেসার-

BanglaBook.org

এর নাম প্রস্তাব করা হল। তিনি তখন অসুস্থতা-পরবর্তী ছুটিতে বা মেডিক্যাল লিভ-এ ফ্রি-টাউনেই অবস্থান করছিলেন। তার সহকর্মীরা তাকে অত্যন্ত সচেতন, সাহসী ও তেজী সৈনিক হিসেবে বিবেচনা করত। তার বাকপটুতা ছিল সর্বজনবিদিত। তাকে নতুন সরকারপ্রধান বানানোর চিন্তাটা প্রায় সকলের পছন্দ হল এবং আমরা তার খোঁজে বের হলাম। সৈনিকদের ইচ্ছা ও আশা-আকঙ্ক্ষার কথা তার কাছে ব্যাখ্যা করা হল। প্রথমে তিনি প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। সাথে সাথেই তাকে বন্দি করে রাষ্ট্রীয় ভবনে পাঠিয়ে দেয়া হল। রাষ্ট্রীয় ভবনে পৌঁছে আমরা সেখানে কেনেমার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল ইয়াহিয়া কানুর সাক্ষাৎ পেলাম। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সৈনিক ছিল ওই ব্যাটালিয়নের সদস্য। লেফটেন্যান্ট মুসা এবং অন্যরা মিলে তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কর্নেল কানুই হবেন নতুন সরকারের প্রধান। অভ্যুত্থানকারী জুনিয়র অফিসারদের তখন একজন প্রবীণ অফিসার দরকার, সরকারপ্রধান হিসেবে যার নাম ঘোষণা করা যাবে। কিন্তু তিনিও সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তাকেও রাষ্ট্রীয় ভবনের একটি কক্ষে বন্দি করে রাখা হল। বন্দি অবস্থায় বিবিসির রবিন হোয়াইট তার ইন্টারভিউ নিলেন। ইন্টারভিউতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন তিনি এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেননি। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল, তিনি যেহেতু অভ্যুত্থানের সাথে নেই, এখন তিনি কী করবেন? উত্তরে তিনি জানালেন, এটা বলা যাবে না। এর পরপরই তাকে পাদেম্বা রোডের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। সবাই জানে এই জেলখানায় যাওয়া মানে মৃত্যুর দিকেই যাওয়া।

কর্নেল কানুর ভাগ্যে যা ঘটেছে তা দেখার পর ক্যাপ্টেন এসট্রেসার নতুন সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম বক্তৃতা প্রচার করতে রাজি হলেন। সৈন্যরা রাজনীতিবিদ, পুলিশ অফিসার এবং সিনিয়র মিলিটারি অফিসারদের নির্বিচারে গ্রেফতার করতে শুরু করল। ১৯৯২ সালের পহেলা মে ক্যাপ্টেন ভি এ এম এসট্রেসারকে চেয়ারম্যান করে 'দ্য ন্যাশনাল প্রভিশনাল রুলিং কাউন্সিল' (এনপিআরসি) নাম দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হল। লেফটেন্যান্ট এসএজে মুসা হলেন এই কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান। নতুন সামরিক সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা যারা মূল সহায়ক-শক্তি হিসেবে তৎপর ছিলাম তাদেরকে চেয়্যারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের কাছাকাছি স্থান দেয়া হল। যদিও আমার বয়স ছিল মাত্র এগার বছর, তথাপি আমি ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জোগাড় করে দিয়ে সাহায্য করেছি এবং লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি যে আমার অভিভাবক ছিলেন এসব কথা স্মরণে রেখে আমার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছিল। আমি ছিলাম লেফটেন্যান্ট মুসার প্রধান দেহরক্ষীদের অন্যতম। প্রতি

BanglaBook.org

মাসের শেষ শনিবার দেশব্যাপী যে 'পরিচ্ছন্নতা দিবস' পালন করা হত আমি ছিলাম তার কেন্দ্রীয় তদারকি কমিটির সদস্য। আমি তখন থেকে পুরোপুরিভাবে আর্মির পোশাক পরা শুরু করলাম। কয়েক মাস পরেই আমার পরবর্তী প্রশিক্ষণ শুরু হল। আমি গোয়েন্দাগিরির উপর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম এবং আর্মির গাড়িতে চলাচল করছিলাম, যদিও আমার মত ছোটখাটো মানুষকে দেখে সৈনিক বলে মনে হত না। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমি আমার আব্বা-আম্মার মৃত্যুর কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। আচার-ব্যবহারে আমি পুরোদস্তুর সৈনিক হয়ে গেলাম। আর্মির ইউনিফর্ম আমার খুবই পছন্দ হয়ে গেল।

সামরিক গোয়েন্দা বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর আমি নিজেই হয়ে গেলাম এই বিষয়ের একজন প্রশিক্ষক। আমি তখন অন্যান্য বালক, এমনকি বালিকাদেরও প্রশিক্ষণ দিতাম। এসময় সরকার বালক-বালিকাদের সমন্বয়ে একটি প্রতি-গোয়েন্দা দল (কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স টিম) গঠন করল। আমিই ছিলাম এই দলের পরিচালক। সফলভাবেই আমাদের কার্যক্রম শুরু হল। আমাদের সফলতার প্রেক্ষিতেই সেনাবাহিনীতে শিশু-সৈনিক বা চাইল্ড সোলজারের ব্যবহার অনুমোদিত হয়ে গেল। ১৯৯৩ সাল নাগাদ এদেশের সেনাবাহিনী তিন হাজারেরও বেশি চাইল্ড সোলজারকে যুদ্ধের টোপ হিসেবে এবং গোয়েন্দা হিসেবে ব্যবহার করেছে। অবশ্য অন্যসব বেসামরিক বালক-বালিকারা আমাদের খুবই প্রশংসা করত। উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। একবার আমরা যখন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর 'বো' পরিদর্শনে গেলাম তখন আমি এবং আর্মির পোশাকে অত্যন্ত চটপটে-দর্শন এক মহিলা-সৈনিকই সমগ্র জনতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলাম। লোকজন আমাদের একনজর দেখার জন্য এত বেশি আগ্রহ দেখাল যে জনসভাই ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য উপস্থিত জনতাকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে আমাদের সাথে এক এক করে হাত মেলানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে সরকারের যেসব লোকেরা অন্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রভাবিত করতে চেয়েছিল তারাই এই ব্যবস্থাটা করায়। আমি ও আমার দল ছিলাম গোয়েন্দা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এটা ঠিক যে আমাদের কাজকারবার অনেক লোকের জীবনের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে। তবে এ ধরনের কাজে আমার মত চাইল্ড সোলজারদের ব্যবহার করাকে সরকার খুবই লাভজনক ও উপকারী বিবেচনা করেছিল।

১৯৯৩ সালে ক্যাপ্টেন মুসাকে (এর মধ্যে তিনি পদোন্নতি পেয়েছিলেন) এনপিআরসির ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠানো হল। সরকারের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য এটা করা

BanglaBook.org

জরুরি হয়ে পড়েছিল। কারণ তিনি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেশ কিছু সম্মানিত নাগরিকের প্রতি অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলেন। তার অপসারণের পূর্বে একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার সন্দেহে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কানু, মেজর কাউটা ডাম্বুয়া এবং স্টাফ সার্জেন্ট কান্ডাপাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সবাই জানেন ক্যাপ্টেন মুসার আদেশে তাদের হত্যা করা হয়। তার আদেশে আরও অনেকের মৃত্যু ঘটে। তাকে অপসারণ করে প্রতিরক্ষা সদর দফতরে তার অধীনে কর্মরত আমরা সকলকে নিয়ে এনপিআরসির চেয়ারম্যান এক সভা ডাকেন। ওই সভায় চেয়ারম্যান তার ভাষণে আমাদের সকলের বীরত্ব, সাহস ও আনুগত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে আমাদের প্রতি তার যথাযথ মনোযোগ অব্যাহত থাকবে। তিনি বললেন, ক্যাপ্টেন মুসা আমাদের পুরস্কার হিসেবে বা মনোবল উঁচু করার জন্য যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সবই রক্ষা করা হবে। তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমার স্কুলে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে তিনি প্রয়োজনীয় সকল কিছুই করবেন। তিনি আমাকে তার এডিসির সাথে দেখা করতে গাড়ি।

পরদিন প্রতিরক্ষা সদর দফতরে আমাদের জন্য একটি জরুরি সভা ডাকা হল। এসময় আমাদের কোনো প্রকার অস্ত্র বহন করতে দেয়া হল না। সেখানে এসে পৌঁছানোর সাথে সাথে আমাদের সকলকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই একটি হেলিকপ্টারে তোলা হল। হেলিকপ্টার উড়তে শুরু করল কিন্তু আমরা জানলাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি। অবশেষে আমাদেরকে প্রতিবেশী দেশ লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়ায় নিয়ে যাওয়া হল। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওই মুহূর্তের অনুভূতি আমি লিখে বোঝাতে পারব না। মানসিকভাবে আমি ভীষণভাবে আহত হলাম। মনরোভিয়াতে পৌঁছানোর পর আমাদেরকে ঠিক সামরিক স্টাইলে 'ফল ইন' হতে আদেশ করা হল। এরপর ইকোমগ (ECOMOG—the Economic Community of West African Monitoring Group. এই বাহিনীতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও নাইজেরিয়ার অফিসার ও সৈনিকরাই ছিল এর প্রধান শক্তি। ECOWAS হল Economic Community of West African States. মোট ১৬টি রাষ্ট্র এর সদস্য।)-এর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল বাম্মিয়া এসে সিয়েরা লিয়ন থেকে আগত কন্টিনজেন্টের নতুন সদস্য হিসেবে ফোর্স কমান্ডারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। কেমন পরিস্থিতিতে আমরা মনরোভিয়া এসেছি সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সজাগ ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর ও উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা দিলেন। পরিদর্শনের সময় হঠাৎ তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি আমার নাম ও বয়স জিজ্ঞাসা করলেন এবং

BanglaBook.org

জানতে চাইলেন আমি সৈনিক কি না! আমার হ্যাঁসূচক জবাব শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। এই হাসিতে অন্যরা সকলেই যোগ দিল। উনি তখন আমাকে তার পিছু পিছু যেতে বললেন। পুরো পরিদর্শন শেষ করা পর্যন্ত আমি তার পিছনে পিছনে থাকলাম। তিনি সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ অফিসার হিসেবে একজন স্টাফ সার্জেন্টকে ডাকলেন এবং আমার মত ছোট বালক কীভাবে এই দলের মধ্যে এল তা ব্যাখ্যা করতে বললেন। তিনি আমাকে খাবার-দাবার দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমি তা গ্রহণ করলেও তার কাছাকাছি থাকতে আমার অস্বস্তি লাগছিল। তিনি আমার দিকে তাকালেই আমার অস্বস্তি বেড়ে যেত। তবু ফোর্স কমান্ডার আসা পর্যন্ত আমাকে তার সাথেই থাকতে হল। তিনি নিজেই ফোর্স কমান্ডারের নিকট আমার কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি আবার অনেক কিছু আমাকেও বর্ণনা করতে বললেন। আমি আমার জীবনের ঘটনাগুলো তাদেরকে শোনালাম। শুনে তারা সবাই মাথা দোলালেন। এরপর ফোর্স কমান্ডার টেলিফোনে ফ্রি-টাউনের প্রতিরক্ষা সদর দফতরে কথা বললেন। তিনি পরে জানালেন ফ্রি-টাউন থেকে চিফ অব স্টাফ জানিয়েছেন যে তিনি আমার মনরোভিয়া আসা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তখন আমার কাছে জানতে চাওয়া হল, আমি কি মনরোভিয়ায় থেকে যেতে চাই নাকি ফ্রি-টাউনে চলে যেতে চাই। আমি বললাম আমি ফিরে যেতে চাই। ইতোমধ্যে সিয়েরা লিয়ন কন্টিনজেন্টের আগমনকে কেন্দ্র করে বেশ ক'জন সাংবাদিক ওখানে হাজির হয়েছিলেন। ফলে তাদের মধ্যে আমার ইন্টারভিউ নেয়ার প্রতিযোগিতা লেগে গেল। কিন্তু ইকোমগের চিফ অব স্টাফ তাদের সে সুযোগ না দেয়ায় তারা আবার পরদিন এসে হাজির হলেন। তখন আমাকে কনফারেন্স রুমে নিয়ে যাওয়া হল এবং আমি সকলের সামনে আমার জীবনকাহিনী বর্ণনা করলাম। আমি ফোর্স কমান্ডারের সাথে মনরোভিয়াতে এক সপ্তাহ থাকলাম। আমাকে ফ্রি-টাউনে পাঠিয়ে দেয়ার আয়োজন করা হচ্ছিল।

ফ্রি-টাউনে ফিরে যাওয়ার দিন ফোর্স কমান্ডার, চিফ অব স্টাফ এবং নাইজেরিয়ান আর্মির বেশ ক'জন সিনিয়র অফিসার আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেলেন। ফোর্স কমান্ডার আমার হাতে একটি খাম দিয়ে বললেন, ওটা আমার জন্য। এরপর তিনি আমার হাতে একটি বাদামী রঙের খাম দিলেন। ওটার উপর সিয়েরা লিয়ন সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের ঠিকানা লেখা ছিল। আমি বিমানে চড়লাম এবং ফ্রি-টাউনে পৌঁছলাম। ফ্রি-টাউনের বিমানবন্দরে আমার সাথে মেজর কুলা সাম্বা নামে এক মহিলার সাক্ষাৎ হল। তিনি ছিলেন 'ডিমোবিলাইজেশন অ্যান্ড রিসেটেলমেন্ট অব চাইল্ড সোলজার' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের লিয়াজোঁ অফিসার। আমরা দুজনেই প্রতিরক্ষা সদর দফতরে যাওয়ার

BanglaBook.org

জন্য হেলিকপ্টারে চড়লাম। ওখানে পৌঁছে আমি দেখলাম চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ, আর্মি চিফ এবং ইউনিসেফের টুপি মাথায় আরও কয়েক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। মেজর সাম্বা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সকলে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। আমাকে চিফ অব আর্মি স্টাফের পাশে দাঁড়ানো একজন সাদা-চামড়ার বৃদ্ধের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। রেভারেন্ড ফাদার বলে পরিচিত এই ভদ্রলোকই 'চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ওয়ার' (CAW)-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার। ওখানে আমরা আধ ঘণ্টার মত ছিলাম; পরে আমরা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের অফিসে গেলাম দীর্ঘ আলাপের পর আমাকে রেভারেন্ড ফাদারের সাথে যেতে বলা হল। আমি কোথায় যাব জানতে চাইলে তিনি আমাকে চিন্তিত না হওয়ার উপদেশ দিলেন। দিনের শেষে আমাকে ফ্রি-টাউনের পূর্বাঞ্চলের একটি স্কুলে চাইল্ড সোলজারদের 'ডিমোবিলাইজেশন সেন্টারে' নিয়ে যাওয়া হল। ওখানে তখন তিন শতাধিক চাইল্ড সোলজার ছিল। আমাকে ওদের সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। যুদ্ধের কারণে পরিত্যক্ত একটি স্কুলে অস্থায়ীভাবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা ছয়েক বৈঠকখানার মত বড় বড় রুমে ম্যাট্রেসের উপর ছেলেদেরকে ঘুমাতে দেয়া হয়েছে। এগুলো স্কুলের ক্লাসরুম ছিল। আমাকে প্রথম রুমে নিয়ে যাওয়া হল এবং একটি ম্যাট্রেস, একটি বালিশ এবং একটি বালতি দেয়া হল। আমি স্বভাবতই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম। কারণ সব ছেলেই ছিল আমার সমবয়সী। মনে হল যেন বড়দের সাথে কাজ করতে করতে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। তাই ভাবলাম এখানে থাকতে পারলে ভালোই হবে। আমাকে এখানে কিছুদিন থাকতে দেয়া হবে কি না আগ্রহভরে তা আমি জানতে চাইলাম। ঘুমানোর জায়গাটা ছিল খানিকটা রুচিবিরোধী। সকল স্টাফ ও কর্মচারীর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। এটা ছিল আমার জন্য এক নতুন জীবনের সূচনা। পরদিন সকাল সাতটায় একটি বেল বাজল; যা ছিল গোসল করার সঙ্কেত। এখানে আমার প্রথম বন্ধু হল আবু বকর যাওয়াদ নামের একটি ছেলে। তার বিছানা ছিল আমার বিছানার পাশেই। সে আমাকে গোসলখানার দিকে নিয়ে গেল। আমরা গোসল সারলাম। আধ ঘণ্টা পর নাশতা করার সঙ্কেত হিসেবে আরেকটি বেল বাজল। নাশতা শেষ করে আমরা প্রধান হল ঘরে গেলাম। এ ধরনের জীবন আমার কাছে অপরিচিত ছিল না কারণ আমি এর আগে অন্য একটি এতিমখানায় থেকে এসেছি। খানিকটা ভিন্নতা সত্ত্বেও আমি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিলাম।

এক সপ্তাহ পর আমি আমার বন্ধুকে বললাম আমি শহরের রাষ্ট্রীয় ভবনে যেতে চাই এবং আমি কিছু জিনিসপত্র কেনাকেটা করতে চাই যার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমার কাছে আছে। সে আমাকে ম্যানেজারের অফিসে নিয়ে

BanglaBook.org

গেল। এখানকার নিয়ম হল ছেলেদের একা বাইরে যেতে না দেয়া। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ছিল আলাদা। ম্যানেজার আমাকে তার ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন এবং জানালেন যে আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। কয়েক মিনিট পর ড্রাইভার এলে আমি কেনাকাটা করতে বের হলাম। আমার সাথে যাওয়াদও ছিল। অল্প কিছু কেনাকাটার পর আমরা রাষ্ট্রীয় ভবনে গেলাম। রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। আমি তার কাছে আমার বিগত কিছুদিনের কাহিনী বর্ণনা করলাম। সব শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, তুমি সত্যিই একজন দুঃসাহসিক বালক! তিনি তার এডিসিকে ডেকে কিছু টাকা দিলেন এবং আমাকে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় কিনে দিয়ে তার বাসায় নিয়ে যেতে বললেন। আমার সাথে আমার বন্ধু ও ড্রাইভার আছে এ কথা তাকে জানিয়ে বললাম, আজ আমাকে ফিরে যেতে হবে। তিনি বললেন, তুমি আজ আর ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছ না। তখন এডিসি প্রস্তাব করলেন আজকের মত আমি যেন ক্যাম্পেই ফিরে যাই এবং পরদিন একজন ড্রাইভার গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আসবে। এডিসি আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যে চলে যাব এ কথা আমি যেন স্কুলে কাউকে না জানাই। আমরা ফিরে এলাম এবং পরদিন সকালে আমার বন্ধুকে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি। এই অল্প সময়েই সে আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। তাই সেও আমার সাথে আসতে চাইল কিন্তু আমি বললাম, এটা সম্ভব নয়।

আমাকে রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবন 'কাবাসা লজ'-এ নিয়ে যাওয়া হল। ওখানে থাকাকালে অনেকদিন ধরে আমার কেবল ভিডিও দেখা ছাড়া আর কোনো কাজই থাকল না। একদিন রাষ্ট্রপ্রধান অফিস থেকে ফেরার পর আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, কখন থেকে আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করব? তিনি জানালেন, এই বিষয় নিয়ে এবং আমাকে আরও বেশি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের উপর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য এডিসি কাজ করছে। এভাবে আমি আবার সামরিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আমার মনে হল রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে লেফটেন্যান্ট স্যান্ডি এবং ক্যাপ্টেন মুসার তুলনায় অনেক বেশি ভালোবাসেন। অবশেষে তার উৎসাহেই আমি সামরিক বিষয়গুলো নিয়ে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। এ পর্যায়ে আমার জীবনটা ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল।

একদিন 'এক্সিকিউটিভ আউটকাম' নামে একটি ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের সদস্যরা রাষ্ট্রপ্রধানের বাসায় এল। এরা হল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ম্যারসিন্‌রি দল। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং দেহরক্ষীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এই দল এনপিআরসি সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। ওরা আমার উপস্থিতি খেয়াল করল এবং আমার নাম ও বয়স জানতে চাইল।

BanglaBook.org

আলাপকালে প্রশ্নকারী বুঝতে পারলেন যে আমি ভালো ইংরেজি বলতে পারি। তাই আমার কাছে তিনি এর আগে আমি কোথায় ছিলাম তা জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, আমি লাইবেরিয়া এবং আমেরিকাতে ছিলাম। তিনি তখন আমাকে হাত ধরে রাষ্ট্রপ্রধানের শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ক্যাপ্টেন এসট্রেসারকে বললেন বিশেষ কিছু অপারেশনের প্রশিক্ষণের জন্য আমার বয়সটাই হল উত্তম। তিনি মত প্রকাশ করলেন, আমার বয়স এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে যদি যথাযথ প্রশিক্ষণ যুক্ত করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে আমাকে সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে। শেষে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি চেয়ে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে রাষ্ট্রপ্রধান রাজি হয়ে গেলেন।

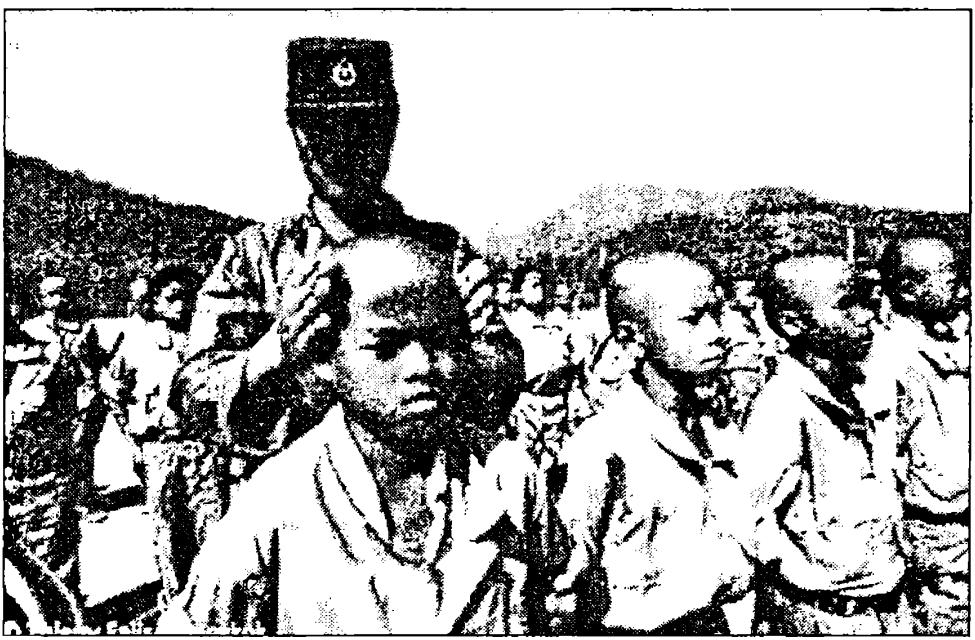

মিয়ানমারের মাদক-ব্যবসার দিকপাল খুন সার ব্যক্তিগত বাহিনী
'মং তাই আর্মি'তে শিশুদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাহিনীপ্রধান ক্যাপ্টেন এসট্রেসারের পতন

১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া হল এবং এক্সিকিউটিভ আউটকাম আমাকে গোয়েন্দাগিরির উপর প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করল। আমাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হল; যেমন : ফিল্ড-ক্রাফ্‌ট, ট্যাকটিক্‌স, ক্যামোফ্লেজ অ্যান্ড কনসিলমেন্ট, সাইট ম্যাপ রিডিং ইত্যাদি। এছাড়াও আমাকে 'ক্লোজ প্রোটেকশন কোর্স' নামে একটি কোর্সও করতে হল যাতে 'ভিআইপি এসকর্টিং' এবং ভিআইপির জন্য অনুষ্ঠানস্থল প্রস্তুতিকরণ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। আমি আমার প্রশিক্ষণ শেষ করে ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে সিয়েরা লিয়ন ফিরে এলাম। এখানে আমাকে বিশেষ বাহিনী বা স্পেশাল ফোর্সের সদস্য করে নেয়া হল এবং 'লেফটেন্যান্ট' র‍্যাংক দেয়া হল। তবে গোয়েন্দা-বিষয়ক বিশেষ কিছু কাজের সাথে যুক্ত থাকার কারণে আমার বেতন ছিল একজন লেফটেন্যান্টের বেতনের দ্বিগুণ।

আমি ছিলাম কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স টিমের প্রধান। আমি একটি ট্রেনিং টিম সংগঠিত করে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলাম। সেনাবাহিনীর সাথে বিভিন্ন অপারেশনে কাজ করছিল এমন একশ'জন চাইল্ড সোলজারকে এই প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেয়া হল। পরে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের পঞ্চাশজন মেয়েও এই দলে যোগ দিল। এই টিমের সকলকে গোয়েন্দাগিরি এবং আর্মি অপারেশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হল। প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তাদের সকলকে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে মোতায়েন করা হল। এদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনকে জঙ্গলে পাঠানো হল আরইউএফের সাথে যোগ দেয়ার জন্য এবং পঞ্চাশ জনকে সম্মুখবর্তী এলাকায় পাঠানো হল যাতে তারা প্রথম দলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। চল্লিশজনেরও বেশি মেয়েকে ফ্রি-টাউনে মোতায়েন করা হল। কেবল রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার, রাষ্ট্রপ্রধানের এডিসি এবং আমিই এদের চিনতাম। এই মেয়েদের কাজ ছিল সরকারের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো ব্যক্তিকে ফাঁদে আটকে ফেলা। আমি ছিলাম এদের প্রধান কর্মকর্তা। ওদিকে আবার গোপনে এডিসি এবং প্রধান নিরাপত্তা অফিসারের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রতিদিনই তা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে রিপোর্ট করা ছিল আমার অন্যতম কাজ।

আমার টিমের সকলকে খুব ভালো বেতন দেয়া হত। আমার জন্য শহরের কেন্দ্রে একটি পৃথক অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করা হয়েছিল। এতে আমার কাজ আরও

BanglaBook.org

দক্ষতার সাথে করা সম্ভব হচ্ছিল। এই অ্যাপার্টমেন্টটাই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। আমাকে একটি গাড়ি এবং আরও অনেক জিনিস দেয়া হয়েছিল যা অন্যরা পায়নি। আমার আর নিজেকে ছোট্ট-বালক বলে মনে হচ্ছিল না। আমার জীবনযাত্রাও ছিল অন্যরকম। আমার অনেক গার্লফ্রেন্ড ছিল। আমি মদ পান করতাম এবং পতিতাদের সাথেও সময় কাটাতাম। এর কিছু করতে হত গোয়েন্দা কার্যক্রমের খাতিরে আর কিছু করতাম নিছক ফুর্তি করার জন্য। এসময়েই আমার মন থেকে আমার আব্বা-আম্মার স্মৃতি হারিয়ে যেতে শুরু করল। আমার সাথে স্ত্রীর মত বসবাস করার জন্য একটি মেয়েকে আমি বেছে নিলাম। আমার বয়সের দ্বিগুণ বয়স্ক লোকদেরকে আমি পরিচালনা করতাম। আমার পরিচিত সমাজে আমার সম্মান ছিল প্রচুর। আমি আর স্কুলে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতাম না। আমার কেবল আগ্রহ ছিল আরও বেশি সামরিক প্রশিক্ষণের। আমার ঊর্ধ্বতন কর্তার অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের পরিকল্পনাই ছিল আমার জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের বেসামরিক কর্মচারী হিসেবে কিছু লোককে আমি রিক্রুট করতে শুরু করলাম। যেমন ট্যাক্সি-ড্রাইভার, হোটেল কর্মচারী, রেস্টুরেন্ট কর্মচারী, সরকারি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেককেই। সমগ্র দেশব্যাপী ছিল আমাদের কাজ। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সকল সদস্যকেই অতি ক্ষুদ্র টেপ-রেকর্ডার সরবরাহ করা হত। দৈনিক ভাতা হিসেবে প্রত্যেককে প্রতিদিন সকালে দশ হাজার লিয়ন (তৎকালে পনের ডলারের সমান) প্রদান করা হত। প্রত্যেকদিন পাঁচশ' লোককে দেয়ার মত অর্থ আমার কাছে থাকত। মাসের শেষে প্রত্যেকেই এক লাখ পঞ্চাশ হাজার লিয়ন এবং এক বস্তা চাল ভাতা হিসেবে পেত। এতে আমাদের অপারেশন হয়েছিল অত্যন্ত কার্যকর ও সফলতাপূর্ণ। অর্থ আমাকে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। সমগ্র সেনাবাহিনীতে আমি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। এমনকি সকলে আমাকে 'জুনিয়র এসট্রেসার' বলে ডাকত। আমি একটি বিশেষ দলকে ইলেকট্রনিক ডিটেক্টরের সাহায্যে প্রেসিডেন্টের অফিস নিরাপত্তামূলক পরীক্ষা করার জন্য সংগঠিত করি। এই টিমের কর্মতৎপরতা ছিল অত্যন্ত কার্যকর। তার নিরাপত্তা নিয়ে আমার সকল উদ্বেগকেই ক্যাপ্টেন এসট্রেসার অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখতেন।

যখন সিয়েরা লিয়নের পূর্বাঞ্চলীয় হীরক-সমৃদ্ধ ডিস্ট্রিক্ট কোনোতে এক্সিকিউটিভ আউটকাম তাদের অপারেশন পরিচালনার জন্য যেতে প্রস্তুত হল তখন ক্যাপ্টেন এসট্রেসার তার পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমাকে সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এক্সিকিউটিভ আউটকাম আমাকে যথেষ্ট সম্মান

BanglaBook.org

দেখাত। কোনোতে আরইউএফ আমাদের অবস্থানের উপর অনেকগুলি আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পুরো পরিস্থিতিকে আমাদের আয়ত্তে রাখতে পেরেছিলাম। এক্সিকিউটিভ আউটকামের সাথে আমার মূল দায়িত্ব ছিল আরইউএফ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং রাষ্ট্রপ্রধান ক্যাপ্টেন এসট্রেসারকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি জানানো। এই দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য খুব সহজ কাজ ছিল। কারণ গোয়েন্দা হিসেবে আমাদের কাউন্টার ইন্টালিজেন্সের কিছু সদস্য আরইউএফের সাথে সেখানে কাজ করছিল। তারা সাধারণত তাদের রিপোর্ট আমাকে দিয়ে যেত যা আমি একত্রিত করতাম এবং এক্সিকিউটিভ আউটকামকে দিতাম। সিয়েরমকো, টঙ্গো-ফিল্ড, রিটাইলস এবং পশ্চিমাঞ্চলের কিছু এলাকায় আমি এই অপারেশন পরিচালনা করি। আমার উদ্যোগ এবং সাহসিকতা এক্সিকিউটিভ আউটকামের প্রশংসা অর্জন করে। পরে অবশ্য একটি হীরকখণ্ডকে কেন্দ্র করে এক্সিকিউটিভ আউটকামের সাথে আমার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। বলা হয়ে থাকে এই হীরকখণ্ডটি ছিল ক্যাপ্টেন এসট্রেসারের আমলে পাওয়া সবচেয়ে বড় হীরক। আমাকে দোষারোপ করা হয় যে এই হীরকখণ্ডটি যে লোক পেয়েছিল তার কাছ থেকে তা এক্সিকিউটিভ আউটকাম চুরি করে ফেলতে পারে—এই আশঙ্কার কথা আমি ক্যাপ্টেন এসট্রেসারকে জানিয়েছিলাম। এর আগে আরও কিছু হীরকখণ্ড চুরি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি রাষ্ট্রপ্রধানকে রিপোর্ট করেছিলাম বলেও আমাকে দোষারোপ করা হয়। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে আমি ভেবে দেখলাম এধরনের মাদকাসক্ত ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সাথে সন্দেহের সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করাটা জীবন-শত্রু বিদ্রোহীদের মধ্যে অবস্থান করার চেয়েও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ফ্রি-টাউনে ফিরে যাব। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে আমি ফ্রি-টাউনে ফিরে গেলাম এবং সেখানে আমার অপারেশনের কাজ পরিচালনা করতে থাকলাম। ১৯৯৬ সালের নির্বাচন শুরু হওয়ার পূর্বাহ্নে ফ্রি-টাউনে আমার উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমি রাজধানীতে ফিরে আসার প্রায় তিন সপ্তাহ পর এনপিআরসি সরকারের কিছু সামরিক সদস্য 'কেইপ লাইট' রেস্টুরেন্টে একটি গোপন মিটিং করল। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ক্যাপ্টেন এসট্রেসারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া সম্পর্কিত। ওই রেস্টুরেন্টে কর্মরত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন মেয়ে-ওয়েটার এই মিটিংয়ের উপর নজরদারি করেছিল। মেয়েটির নিকট থেকে বিষয়টি জেনে আমি তা ক্যাপ্টেন এসট্রেসারকে জানালাম। নিজের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নেয়া ক্যাপ্টেন এসট্রেসারের জন্য খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া ওরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

BanglaBook.org

তিনি তাই এই ক্যু পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে বরখাস্ত করার পূর্বে নিজের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সৈনিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করলেন।

১৯৯৬ সালের ১৩ই জানুয়ারি রাতে ওই মহিলা আমাকে জানাল যে, কেইপ লাইটে আরেকটি মিটিং হচ্ছে। এই খবরটিও আমি রাষ্ট্রপ্রধানকে জানালাম। তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ওখানে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আদেশ দিলেন। আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে ওখানে গেলাম। গেটের ভিতরে ঢোকার আগেই ডেপুটি চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট কর্নেল মা'দা বিও'র কয়েকজন দেহরক্ষী আমাকে বাধা দিল। অথচ ওরা আমাকে ভালোভাবেই চেনে। ওরা বলল, এখন কাউকেই রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেয়া যাবে না। এতে আমার সাথে তাদের বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। হৈচৈ শুনে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা বেরিয়ে এসে কী হচ্ছে জানতে চাইলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি সৈনিকদেরকে পথ ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি আমার আগেই তাড়াতাড়ি রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লেন। আমি ঢুকে দেখি ততক্ষণে মিটিং শেষ হয়ে গেছে। আমি খাবারের অর্ডার দিলাম আর তারা সবাই রেস্টুরেন্ট থেকে চলে গেল। আমি ওয়েট্রেসের কাছ থেকে গোপনে মিটিংয়ের কথাবার্তা রেকর্ড করা ক্যাসেটগুলো সংগ্রহ করলাম। আমি জানতাম প্রধান নিরাপত্তা অফিসার সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবনে যাবেন। আমি তাই তার পিছু না নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে গেলাম। পরদিন সকালে আমি এসট্রেসারের কাছে আমার রিপোর্ট দিলাম। ওদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এধরনের একটি বিষয়ের উপর তাদের অভিযুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই দেখে তিনি অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। জানুয়ারির ১৫ তারিখে তিনি একটি মিটিং ডাকলেন। ওই মিটিংয়ে তিনি সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি তার ক্যাবিনেট ঢেলে সাজাবেন। পরদিন ব্যাঙ্গুয়েমা মিলিটারি একাডেমিতে নতুন সৈনিকদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের পর মিটিং পুনরায় হবে বলে ঘোষণা দিয়ে সেদিনের বৈঠক শেষ করলেন।

১৬ই জানুয়ারি সকালে আমরা একটি কনভয়যোগে ব্যাঙ্গুয়েমা একাডেমির কুচকাওয়াজে চলে গেলাম। সবকিছুই ঠিক ছিল কেবল ডেপুটি চেয়ারম্যানসহ অধিকাংশ সিনিয়র অফিসারের মেজাজ-মর্জি ভালো মনে হচ্ছিল না। পূর্বদিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের পরপরই ককেরেলে অবস্থিত প্রতিরক্ষা সদর দফতরে আগের দিনের অসমাপ্ত মিটিং হওয়ার কথা ছিল। কুচকাওয়াজের পর রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার (যিনি ছিলেন একজন মেজর) রাষ্ট্রপ্রধানকে জানালেন যে, তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান মা'দা বিও এবং অন্য সিনিয়র অফিসারদের সাথে চলে যেতে চান যাতে তিনি মিটিংয়ের প্রস্তুতি তদারক করতে পারেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানকে সড়কপথেই মিটিংয়ের স্থানে যাওয়ার

BanglaBook.org

পরামর্শ দিয়ে যান। নিরাপত্তা কর্মকর্তার যুক্তি হল, এতে তার কাজ সহজ হবে কারণ তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেই বাসায় চলে যেতে পারবেন। ক্যাপ্টেন এসট্রেসার প্রধান নিরাপত্তা অফিসারকে বিশ্বাস করতেন এবং তার স্বার্থেই নিরাপত্তা অফিসার সকল কাজ করবে ভেবে তার দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ফলে তারা একটি হেলিকপ্টারে চড়ে রওনা হল এবং আমরা একটি কনভয়যোগে রওনা হলাম। পথে কথাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধানকে বললাম, তার সহকর্মীদের মনোভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমার কাছে সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না। শুনে তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন একজন স্বল্প-অভিজ্ঞ ছোট্ট বালকের দিকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখছেন। তিনি আমার মনের কথা বুঝতে ব্যর্থ হলেন বলেই আমার মনে হল। অথচ অতি অল্পসময়ের ব্যবধানেই সমগ্র দৃশ্যপট বদলে গেল। আমরা প্রতিরক্ষা সদর দফরে পৌছানোর পর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সকল সৈনিককে নিজ নিজ গাড়িতে বসে থাকার আদেশ দিলেন। ওরা সকলে ছিল তার প্রতি অনুগত। তারা তার হুকুম মোতাবেক গাড়িতেই বসে রইল। আমি রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কনফারেন্স হলের দিকে এগোলাম। কিন্তু প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা আমাকে হলে প্রবেশের পথে থামিয়ে দিলেন। এটি ছিল অস্বাভাবিক ঘটনা! আমি বুঝে নিলাম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী লে. কর্নেল টমি নায়ুমা এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে প্রতিরক্ষা সদর দফতরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নিরাপত্তায় কর্মরত সৈনিকদের অস্ত্রহীন করে ফেললেন। আমি বুঝলাম নিরাপত্তা দলের জ্ঞাতসারে এটা ছিল একটি সামরিক অভ্যুত্থান বা ক্যু। ফলে রাষ্ট্রপ্রধান এসট্রেসারের বাধ্য স্বল্প সংখ্যক সৈনিকের নিজ নিজ অস্ত্র হস্তান্তর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। এদের অস্ত্রহীন করার পরপরই আমি দেখলাম রাষ্ট্রপ্রধান ক্যাপ্টেন এসট্রেসারকে হাতকড়া লাগিয়ে হল থেকে বের করে আনা হচ্ছে। এইসব দেখে আমি তাড়াতাড়ি প্রতিরক্ষা সদর দফতর থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী মিলটন মার্গো স্কুলের বাউন্ডারির মধ্যে চলে গেলাম। এটা ছিল অন্ধদের স্কুল। সেখানে বসে আমি রেডিওতে এনপিআরসির সেক্রেটারি জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল কারিফা কার্গবোর ঘোষণা শুনতে পেলাম। এতে বলা হল এনপিআরসির নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে এবং পুনর্গঠিত এনপিআরসির নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মা'দা বিও, যিনি ছিলেন এসট্রেসারের ডেপুটি চেয়ারম্যান। তাঁকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হল।

BanglaBook.org

আত্মসমর্পণ

এই ঘোষণা শোনার পর আমি ভীষণ ভেঙে পড়লাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কী করা উচিত! আমি জানতাম নতুন নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আমাকে ভয় করার যথেষ্ট কারণ আছে এবং আমার মত ছোট একজন মানুষ তাদের ভীত করে রাখার চেয়ে আমাকে শেষ করে দেয়াটাই হচ্ছে তাদের জন্য সহজ ও নিরাপদ কাজ। সুতরাং তারা আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। আমি তাই মেজর কুলা সাম্বার কাছে চলে গেলাম। যুদ্ধের পূর্ব থেকেই তিনি আমার আব্বাকে জানতেন এবং আমার ব্যাপারে তার দরদ ছিল যথেষ্ট। গ্রাফটন স্কাউট ট্রেনিং ক্যাম্পে তাদের কিছু চাইল্ড সোলজার ছিল। তখনও আমার বয়স ছিল ১৬ বছরের কম। মেজর কুলা বললেন, তিনি আমাকে পরদিন সকালে ওই ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন এবং আসল পরিচয় গোপন রেখে ওখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করবেন। আমাকে রক্ষা করার জন্যই ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা তথ্য দেয়া হবে। তিনি আমাকে তখনই সমাজ-কল্যাণ কর্মকর্তা মিসেস মাক্যুয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন ওই ক্যাম্পের দায়িত্বে। মেজর কুলা উনার কাছে আমার সত্য কাহিনী বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তার মনে হল তিনি যেহেতু বেসামরিক লোক, আমার সম্পর্কে সত্যিকারের কাহিনী শুনলে তিনি হয়তো ভয় পেয়ে যাবেন এবং আমাকে ওই ক্যাম্পে রাখার ব্যাপারে সন্দিহান হয় পড়বেন। তিনি তখন উনাকে অন্যরকম একটি কাহিনী শোনালেন। আমাকে উপদেশ দিলেন আমি যেন এমন ভান করি যে আমি ইংরেজি বলতে পারি না। তাতে মিসেস মাক্যুয়ে ও সাংবাদিকদের অনেক প্রশ্নকে এড়ানো যাবে। তিনি আমাকে পরার জন্য একজোড়া বাজে পোশাকও জোগাড় করে দিলেন। এরপর তিনি আমাকে ইউনিসেফ অফিসে নিয়ে গেলেন এবং সেখানেও একই মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করলেন। এর আগে ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথমবারের মত 'চাইল্ড কম্বাট্যান্ট ডিমোবিলাইজেশন সেন্টার' পরিদর্শন করার জন্য একদল ইউনিসেফ প্রতিনিধি সিয়েরা লিয়ন এসেছিলেন বলে সেই উপলক্ষে আমার সাথে ইউনিসেফের লোকদের পরিচয় হয়েছিল। আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতার মুখোমুখি না হওয়ার জন্যই এসট্রেসার সরকারের আমলে আমাকে এই ক্যাম্পে আনা হয়েছিল। সেই কারণে তখন আমি মাত্র দুই দিন এই ক্যাম্পে অবস্থান করি। মনে পড়ে, ১৯৯৫

BanglaBook.org

সালের ৪ঠা নভেম্বর ওই প্রতিনিধি দল ফিরে যাওয়ার পর 'এক্সিকিউটিভ আউটকাম'-এর সাথে অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য আমি কোনোতে চলে যাই।

১৭ই জানুয়ারি তারা আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ক্যাম্পে ইউনা মাকাউলি নামে এক ব্রিটিশ মহিলার সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি ব্রিটেনে সেভ দ্য চিলড্রেনের সাথে কাজ করছিলেন। আমার ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে অনেক বিষয়ে জানার চেষ্টা করেন। তবে মেজর সাম্বা আশেপাশেই ছিলেন। এছাড়াও সামরিক শিক্ষা বিভাগের মেজর ম্যাক্স কাঙ্গা নামের একজন অফিসার মেজর সাম্বার সাথে মিলে বহিরাগত লোকদের শোনানোর জন্য এমন একটি কাহিনী আমাকে বলে দিলেন যাতে সেনাবাহিনীর মুখ রক্ষা হয়। ইউনিসেফ প্রতিনিধিদলের সাথে আসা সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমাকে উপদেশ দেয়া হল আমি যেন ইংরেজিতে কথা না বলি। এ কারণে যদিও ইউনিসেফ জানত যে আমি একজন চাইল্ড সোলজার, তারা সত্য কাহিনী জানতে পারল না।

ওদিকে সরকার আমাকে পুরো শহরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিন্তু তারা জানত না যে আমি চাইল্ড সোলজারদের সাথে ক্যাম্পেই আছি। আমাদের তত্ত্বাবধানকারী ইউনিসেফ ও অন্যান্য এনজিও সংগঠনের নিকট থেকে আমার কাহিনী গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মেজর ম্যাক্স ও মেজর কুলা সম্ভব সকল কিছুই করলেন। তারা প্রতিদিনই আমার সাথে দেখা করে উপদেশ দেন, আমি যেন তাদের কোনো স্টাফ বা বাইরে থেকে আসা কোনো সাংবাদিকের সাথে কোনো বিষয়েই আলাপ না করি। আর্মির সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা গোপন করার জন্য অনেক নতুন গল্প সাজানো হয়। কিন্তু তখনও আর্মি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কারণ ওরা মনে করত যে, আমি বর্তমান সরকারের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব এবং তাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ।

এই দফায় আমার সমবয়সীদের সাথে থাকাটা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দেখা দিল। গ্রাফটনে ছেলেদের সাথে আমি মোটেই সুবিধা পাচ্ছিলাম না। একদিন 'চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়ার' নামক এক এনজিও সংগঠনের কিছু কর্মী গ্রাফটন থেকে আমাকে নিয়ে আসতে গেল, কারণ এর আগে ইউনিসেফের মাধ্যমে সেনাবাহিনী আমাকে এদের কাছে হস্তান্তর করে। সেনা কর্মকাণ্ডের সাথে আমি ব্যাপকভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও এরা আমার ব্যাপারে তখনও বেশ আগ্রহ দেখায়। এ কারণেই আমাকে আবার ফ্রি-টাউনে ফিরে আসতে হয়। বিভিন্ন এনজিওর সাথে কাজকর্ম আর ক্যাম্পের জীবন নিয়ে আমি এক সময় হাঁপিয়ে উঠি। দীর্ঘদিনের সাহচর্যের কারণে আমি আর্মির জীবনেই

BanglaBook.org

অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য সেনা কর্মকাণ্ড ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মধ্যে ডুবে থাকা মুশকিল হয়ে ওঠে। আমি তাই স্বেচ্ছায় প্রতিরক্ষা সদর দফতরে গিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ধরা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ভাগ্যে কী আছে তা-ই আমি দেখতে চাই। কারণ ক্যাপ্টেন এসট্রেসারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি আত্মগোপন করেই আছি এবং আমার বদ্ধমূল ধারণা হল যে, পাকড়াও করতে পারলে ওরা আমাকে কঠিন শাস্তিই দেবে। আবার এভাবে পালিয়ে থাকতেও আমার আর ভালোলাগছিল না।

আমি তাই সরাসরি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মা'দা বিওর কাছে চলে গেলাম। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অসাধারণ। প্রতিরক্ষা সদর দফতরে প্রবেশের সাথে সাথেই আমাকে বন্দি করে হাত বেঁধে ফেলা হল এবং এন্তার কিল-লাথি দিয়ে পেটানো হল। এরপর ওরা আমাকে চিফ অব স্টাফের অফিসে নিয়ে গেল। আমার শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছিল। ওরা আমার কাছে এদ্দিন কোথায় ছিলাম তা জানতে চাইল। একজন প্রশিক্ষিত সৈনিক ও গোয়েন্দা হিসেবে একটি বানানো কাহিনী এদেরকে বলতে হল যেন আমাকে যারা সাহায্য করেছিল তাদের কোনো সমস্যা না হয়। আমি জানি ওরা আমাকে একবিন্দুও বিশ্বাস করেনি। কারণ কত নৈপুণ্যের সাথে আমি কোনো বিষয়কে সামাল দিতে পারি তা ওরা জানত। ইতোমধ্যে এসট্রেসারের অনুগত প্রায় একশ' সৈনিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরা আমাকে দায়ী করল যে আমি ওদের সবার খোঁজ-খবর জানি এবং আমরা সরকারের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার জন্য কাজ করছি। আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলাম, আইভান বলেই যে ওরা আমাকে ঘৃণা করছিল তা নয় বরং ওরা আমার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। ওরা ধরেই নিয়েছিল যে, আমি তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি। তাই আলোচনার মাধ্যমে ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে আমাকে নির্বাচন পর্যন্ত আটক রাখবে। এখানে বলে রাখা প্রাসঙ্গিক হবে যে, পূর্ববর্তী সামরিক সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন দেয়ার ব্যাপারে মা'দা বিওর সামরিক সরকারও আন্তরিক ছিল। এদিকে মেজর কুলা তখনও আমার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ফলে কারও কারও মনোভাব আমার জন্য নমনীয় হয়ে আসে এবং আমাকে মাত্র তিন দিন গার্ডরুমে বন্দি থাকতে হয়। পরে ওরা আমার বাসায় গিয়ে যোগাযোগ-সরঞ্জামগুলো সরিয়ে ফেলে এবং আমাকে সাবধান করে দেয় যেন আমি আর কখনও প্রতিরক্ষা সদর দফতরের দিকে পা না বাড়াই।

BanglaBook.org

আমি আবারও হতাশার মধ্যে পড়ে গেলাম। মেজর কুলা আমাকে সাহায্য করেই যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে স্কুলে ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন। এর মধ্যে কিছু কিছু এনজিওতে চাকরিরত অনেকেই আমার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। একজন ব্রিটিশ মহিলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ইউনা মাকাউলি নামের সেভ দ্য চিলড্রেনের সেই মহিলার কথা আমি আগেই বলেছি। তিনি চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ওয়ারকে আমার পড়াশোনায় পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কিছু টাকা দিলেন। সিএডবি-উ-র কর্মীরা এবং মেজর কুলা আমাকে প্রিন্স অব ওয়েলস সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে গেলেন। তারা আমাকে স্কুলে ভর্তি করাতে চাইলেন। আমার সাথে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে তা বোঝার সুবিধার্থে তারা প্রিন্সিপালকে আমার অতীত জীবনের কিছু ঘটনার কথা বললেন। আমি আবার স্কুল-জীবনে ফিরে গেলাম। আমি যেনতেন ধরনের কোনো সৈনিক ছিলাম না বরং আমি ছিলাম একজন সুপ্রশিক্ষিত গোয়েন্দা কর্মকর্তা। তাই স্কুলের শৃঙ্খলা ও অন্য ছাত্রদের সাথে পড়াশোনায় নিজেকে খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিই। প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে অধিকাংশ শিক্ষকই আমাকে খুব খাতির করতেন। আমার বন্ধুরা আমাকে খুবই ভালোবাসত। মনে হল আমি আমার হারানো কৈশোরকে ফিরে পেতে শুরু করেছি।

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে আমাকে এবং অন্য তিনজন চাইল্ড সোলজারকে ইউনিসেফ বাছাই করল এবং পৃষ্ঠপোষকতা করল ক্যামেরুনের ইয়াউনডে ও ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু সম্মেলনে সিয়েরা লিয়নের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। আমার বিদায়ের পূর্বে মেজর সাম্বা আমাকে মেজর কাঙ্গার কাছে নিয়ে গেলেন। আমার ভালোমন্দ ও পাড়াশোনার ব্যাপারে এরা ছিলেন একান্তভাবেই দরদী ও আগ্রহী। তবে একই সাথে তারা সরকারের স্বার্থরক্ষা করেও চলতেন। তারা জানতেন আমার সত্যিকার কাহিনী প্রকাশ পেলে তা হবে দেশের সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিব্রতকর। তাই যখনই আমার জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন পড়ত, তার পূর্বেই তারা আমাকে কনফারেন্সে কী কী জিনিস বলা যাবে আর কী কী বিষয়ে কথা বলা উচিত হবে না তা প্রস্তুত করে দিতেন। যেহেতু একসময় আমি সৈনিক ছিলাম, আমি সর্বদাই আমার উপরস্থদের কথা শুনতাম এবং ঠিক সেভাবেই কাজ করতাম। বিশ্ব শিশু সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল এবং এতে আমার অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা হল।

দেশে ফেরার পর আমাকে সিয়েরা লিয়নের 'ডিমোবিলাইজড চাইল্ড সোলজার'দের নিয়ে গঠিত সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়। পরে আমি

BanglaBook.org

আমার পদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অনেক করফারেন্স, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করি। এভাবে আমি বেসামরিক জীবনে ফিরে আসতে শুরু করলাম। আমার জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং তারা আমাকে অন্য চাইল্ড সোলজারদের কাছে আদর্শ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতেন।

উৎসমূল এবং জন্মসূত্রে আমি একজন সিয়েরা লিয়নি হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু জীবনের শুরুতেই প্রায় এক দশককাল আমি আমেরিকা ও লাইবেরিয়াতে কাটিয়েছি তাই আমি আমার দেশ সিয়েরা লিয়নে এবং আমেরিকাতে আমাদের পরিবারের কে কোথায় আছে সে সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না। এবার এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলাম। আমি আমার পরিবার বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলাম। আমার যতটুকু স্মরণ ছিল তা থেকে আমেরিকায় অবস্থানকারী আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে তাদের কিছু তথ্য দিলাম। আমার দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে ওরা আমার এক মামাকে আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার রেলিহ্ থেকে খুঁজে বের করল। তিনি ছিলেন আমার মায়ের আপন বড় ভাই। তিনি জার্মানিতে অবস্থানকারী আমার এক চাচার ঠিকানা দিলেন। তারা মিলে আমাকে যেসব তথ্য দিলেন তাতে আমি ফ্রি-টাউনে এবং সিয়েরা লিয়নের অন্যান্য প্রদেশে অবস্থানকারী আমাদের কিছু আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হলাম। আমি আমার এক চাচার ছেলে-মেয়েদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলাম। এদের অনেকে আমার সম্পর্কে আগে শুনেছে এবং দেখেছেও, কিন্তু জানত না যে আমি তাদেরই চাচাত ভাই। তাদের আব্বাও যুদ্ধের সময় নিহত হন। পুজেহুনে আমাদের কিছু আত্মীয় ছিলেন যারা নিজেদের মূল আবাস থেকে উচ্ছেদ হয়ে দেশের অন্যত্র বসবাস করছিলেন। আমরা তাই ওখানে গিয়ে তাদের খোঁজ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেবার আমি আমার নানির সাথে দেখা করার সুযোগ পাই। এর আগে আমি তাকে কখনও দেখিনি। বিদ্রোহী ও সৈন্যরা তার অন্য সন্তানদের হত্যা করে। আমার নিকটাত্মীয়দের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগই গৃহযুদ্ধে নিহত হন এবং বাকি ৬০ ভাগকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি তাই আমার চাচাত ভাইয়ের সাথে ফ্রি-টাউনে ফিরে এলাম। মতের মিল ছিল না বলে আমি তাদের সাথেও বসবাস করতে পারিনি। তাদের আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। আমি তাই নিজের মতই ছিলাম এবং সেনা-জীবনের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে স্কুলের পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে উঠি। এনপিআরসি-প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মা'দা বিওর তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত দেশের

BanglaBook.org

প্রথম বহুদলীয় অবাধ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন এসএলপিপি (সিয়েরা লিয়ন পিপলস পার্টি)-প্রধান আলহাজ ড. আহমেদ তেজান কাব্বাহ। আমার দিনকাল ভালোই যাচ্ছিল বলা যায়। অবশ্য তখনও আমি সেনাবাহিনী থেকে বেতন পেতাম এবং সেনাপ্রধানের জন্য কিছু কিছু কাজ আমাকে করতে হত। জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল এবং ভালোভাবেই আমার স্কুল চলছিল। কিন্তু বেশিদিন না যেতেই আরেক অঘটন ঘটে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কাব্বাহ সেনা সরকারের উৎখাত

সেদিন ছিল রোববার, ২৫শে মে ১৯৯৭। ভোর তিনটার দিকে আমি আমার কিংসটন ব্রিজের বাসা থেকেই গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। প্রশিক্ষিত সৈনিক হিসেবে এটাকে আমি গুরুত্ব না দিয়ে পারি না। আমি টেলিফোন তুলে আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম যারা তখনও সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরি করছিল। কিন্তু দশ মিনিট ধরে টেলিফোন ঘুরিয়েও ওদের কাউকে পেলাম না। আমি আঁচ করলাম নিশ্চয় কোনো গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। আমি সেনাবাহিনীপ্রধানকে টেলিফোন করার সিদ্ধান্ত নিলাম, কারণ তার সাথে আমার ভালো ঘনিষ্ঠতা ছিল।

সেনাপ্রধান জানালেন তিনি তার অধীনস্থ কোনো কমান্ডারকেই খুঁজে পাচ্ছেন না, তবে এটুকু জানতে পেরেছেন যে সেনাবাহিনীই এই ফায়ারিং শুরু করেছে। তিনি জানতে চাইলেন, আমার পক্ষে তার কাছে যাওয়া সম্ভব কি না। আমি সম্মতি জানালাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম যে, সেনাবাহিনীই প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর এসএলপিপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। সেনাবাহিনীপ্রধানকে দেয়া গোয়েন্দা প্রতিবেদনে পূর্বেই আমি একথার উল্লেখ করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে শুধু এটুকুই বলেছিলেন যে, তিনি বিষয়টি প্রেসিডেন্টকে অবহিত করবেন।

শেষ পর্যন্ত আমি তার কাছে পৌঁছলাম। ওই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে কিছুই করার ছিল না। কারণ সেনাবাহিনীর নব্বই শতাংশেরও বেশি সদস্য অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থন-সহায়তা করছিল। দুটি কারণে তারা প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর সরকারের প্রতি বিরক্ত ছিল। এক. এই সরকার কামাজোর মিলিশিয়া গ্রুপকে সমর্থন করছিল এবং দুই. সরকার তাদের প্রতি এই অপবাদ দিচ্ছিল যে সৈন্যরা বিদ্রোহীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। আমি ওখানে যতক্ষণ ছিলাম ওই সময়ের মধ্যেই গোয়েন্দা পরিদপ্তরের প্রধান কর্নেল ম্যাক্স কাঙ্গার সাথে প্রেসিডেন্ট কমপক্ষে পাঁচবার টেলিফোনে কথা বললেন। আমি কর্নেল ম্যাক্স কাঙ্গাকে কেবল এটুকুই বলতে শুনেছিলাম যে ঘটনা গুরুতর তবে তারা সবকিছু আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছেন। এক পর্যায়ে আমি শুনলাম তিনি প্রেসিডেন্টকে কোথাও চলে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের সাথে শেষবার কথাবার্তা শেষ হওয়ার পরপরই আমরা চারজন (চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান কোনটেহ্ এবং কর্নেল ম্যাক্সসহ) ছদ্মবেশে একটি নিশান প্যাট্রল জিপে চেপে উপ-

BanglaBook.org

প্রতিরক্ষামন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন হিঙ্গা নরমানের বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। তাকে দেখে আমার মনে হল তিনিও কোথাও চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সৈনিকদের প্রায় সকলে বিশ্বাস করত যে চিফ নরমানও প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকারীদের একজন। ফলে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা-কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সৈনিকদের কাছে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তিনি, কর্নেল কাঙ্গা এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কোনটেহ্ মিলিতভাবে চেষ্টা করেও অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ পরিচালনার জন্য দুই কোম্পানি সৈন্যও জোগাড় করতে পারলেন না। এদিকে সকাল হতে বেশি দেরি নেই। তাই আমরা প্রেসিডেন্ট লজে চলে গেলাম এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর সাথে দেখা হল। তার হাতে তখনও সমস্যার কোনো সমাধান ছিল না। সবাই তাকে বসে থাকতে বললেন এবং তারা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এরপর আমরা প্রতিরক্ষা সদর দফতরে গেলাম। সেখানে সৈন্যরা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ ও চিফ অব স্টাফকে বন্দি করতে চাইল কিন্তু পুরো অপারেশনটাই তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না বলে তারা তেমন কিছু করল না। ওদিকে তারা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ ও চিফ অব স্টাফের দেয়া নির্দেশ পালন করা থেকেও বিরত থাকল। এর মধ্যে জেনারেল সাহেব ও কর্নেল সাহেব বুঝে নিলেন যে পরিস্থিতি গুরুতর তখন তারা নিজেরা পালানোর পরিকল্পনা করতে শুরু করলেন। এর মধ্যে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার গোপন আস্তানা হোটেল মাম্মি-য়োকেতে চলে গেলেন। সকাল ছ'টার দিকে আমি আর্মি চিফকে এই বলে পরামর্শ দিলাম যে রক্তপিপাসু উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা আমাদের উচিত হবে না। এর মধ্যেই তিনি অবোধ শিশুর মত হয়ে গেছেন। তিনি আমার এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। আমরা তার বাসভবনে ফিরে এসে দেখলাম তার দেহরক্ষীদের অধিকাংশ সৈনিকই লা-পাত্তা হয়ে গেছে। বোঝা গেল ওরা সকলেই অভ্যুত্থানকারীদের সাথে যোগ দিতে শহরে চলে গেছে।

এতসব ঘটতে দেখে কর্নেল কাঙ্গা কেঁদে ফেললেন। কারণ তিনি জানতেন বিদ্রোহী সৈন্যরা তার উপরও কতটা বিরক্ত! তিনি এও জানতেন যদি তিনি ওই সৈন্যদের কবলে পড়েন তাহলে ওরা নিশ্চিতভাবেই তাকে খুন করবে। অত্যন্ত করুণভাবে কর্নেল ম্যাক্স কাঙ্গা আমাকে এবং তার ড্রাইভারকে অনুরোধ করলেন আমরা যেন তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করি। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কর্নেল ম্যাক্সের বাসায় গিয়ে তার অনুরোধ রক্ষা করলাম। পরে তিনি আমাকে তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মেজর কুলা সাম্বাকে ডেকে আনতে বললেন। সৈনিকরা যত্রতত্র চেক পয়েন্ট বসিয়েছে এবং এসব জায়গায় বিড়ম্বনা থেকে বাঁচার জন্য আমি এর মধ্যেই গায়ে ইউনিফর্ম চাপিয়ে নিয়েছি। আমি মেজর

BanglaBook.org

কুলা সাম্বাকে তার বাসা থেকে কর্নেল ম্যাক্সের ঘরে নিয়ে এলাম। তার আশেপাশে যে কয়েকজন সৈন্য অবশিষ্ট ছিল তারাও আমি ফিরে আসার আগেই ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। অতএব তখনকার মত কর্নেল কাঙ্গা, মেজর কুলা ও আমি এই তিনজনই কেবল ওই বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। ওইদিনই সকাল আটটার দিকে তিনটি ল্যান্ড রোভার জিপ ভর্তি হয়ে একদল সৈনিক এল এবং কোনোরকম প্রশ্ন ছাড়াই আমাদেরকে বন্দি করে প্রতিরক্ষা সদর দফতরে পাঠিয়ে দিল। ওখানে আমরা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কোনটেহ্সহ অনেক সিনিয়র অফিসারকে দেখতে পেলাম। তাদের সকলকেই বন্দি করা হয়েছে। অভ্যুত্থানকারীদের দৃষ্টি ছিল কেবল সিনিয়র মিলিটারি অফিসারদের উপর নিবদ্ধ। তাছাড়া অভ্যুত্থানকারীদের অধিকাংশই ছিল আমার পূর্ব পরিচিত বন্ধু। তাই তারা আমাকে ছেড়ে দিল এবং অভ্যুত্থানে যোগ দিতে বলল।

আমি কয়েকজন সৈনিককে সাথে নিয়ে আমার বাসায় চলে গেলাম। তখনও কিন্তু বিষয়টা পরিষ্কার হয়নি, কে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন। বয়সে ছোট হলেও আমি এমন একজন সৈনিক যে আগের সরকার ও জান্তাদের সময়ও ঘটনার কেন্দ্রেই ছিলাম। ফলে আমাকে অভ্যুত্থানের পক্ষে দেখতে পেয়ে অনেক সৈনিকই অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে আমার কাছে এল। আমি তাদের সাথে গাড়ি চালিয়ে শহরে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম এবং শেষে অ্যামুনিশন ডাম্পে গিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষায় ব্যবহারের জন্য দুটি গাড়িভর্তি গোলাবারুদ আমার বাসায় নিয়ে এলাম। কারণ আমি জানতাম যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারকে এভাবে উৎখাত করার ফলাফল ভালো হবে না। আমি এও জানতাম যে অভ্যুত্থানকারী আর্মির উপর একটি প্রতি-আক্রমণ হবেই। পরে আমি কর্নেল কাঙ্গার বাসায় গিয়ে প্রচুর পরিমাণ খাবারদাবার এবং তার কিছু দামি জিনিসপত্র আমার বাসায় নিয়ে এলাম। এরপর কিছু সৈন্যকে আমার বাসার চতুর্দিকে মোতায়েন করে আমি আমার ইউনিফর্ম খুলে বিশ্রাম নিলাম। ওই দিনই সকাল এগারটার দিকে আমি যখন আমার কিংসটন ব্রিজের বাসায় রেডিও শুনছিলাম, তখন মেজর জনি পল কুরোমার নেতৃত্বাধীন নতুন সামরিক জান্তা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চাকরিরত এবং চাকরিতে নেই এমন সকল সৈনিককে সেনা সদর দফতরে রিপোর্ট করতে বলল। এর অল্প আগেই সৈনিকরা মেজর জনিকে কারাগার থেকে বের করে আনে।

যদিও সেদিন সকালে কিছু অপারেশনের সাথে আমি ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়ে যাই তবু সামরিক চাকরিতে আর কোনো উৎসাহ অনুভব করলাম না। এ কারণেই বারবার প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি শোনার পরও আমরা, কয়েকজন অনাগ্রহী সৈনিক, সেনা সদর দফতরে না গিয়ে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকলাম। সারাদিন আমি বাসাতেই ছিলাম এবং আমার সাথে আর কোনো

BanglaBook.org

অঘটন ঘটল না। পরদিন অর্থাৎ ২৬শে মে তারিখে আমি কনসার্ন ইউনিভার্সালের অফিসে গেলাম। কেনেথ রজার্স নামে আমার এক চাচা সেখানে কাজ করতেন। আমাকে যারা সামরিক কর্মকাণ্ডের বাইরে থাকার পরামর্শ দিতেন তাদের মধ্যে

রেভল্যুশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা ফুদে সাঙ্কোকে
তার অনুসারীরা 'পোপে' অর্থাৎ পিতা বলে ডাকে

এই চাচা ছিলেন অন্যতম। আমি তাকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আমেরিকায় বসবাসকারী আমার খুঁজে পাওয়া মামা এবং লাইবেরিয়ায় অবস্থানকারী সেভ দ্য চিলড্রেনের সেই ব্রিটিশ মহিলার সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন। দুজনের সাথেই আমার টেলিফোনে কথা হল। তারা আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যেন এসব ঘটনা থেকে দূরে থাকি এবং দেশ ছেড়ে লাইবেরিয়া বা গিনির যেকোনো স্থানে চলে যাওয়ার পথ বের করার চেষ্টা করি। আমি বাসায় ফিরে এলাম এবং তাদের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

তখন রাজধানী শহর ফ্রি-টাউনের সবকিছুতেই বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ওয়ারের প্রোগ্রাম ম্যানেজার রেভারেন্ড ফাদার থিওফিল্লাম মোমেদিও আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি এবং আরও ক'জন চাইল্ড সোলজার, যাদের ব্যাপারে সামরিক জান্তার ভীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরেই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তিনি আরও জানালেন, যদিও তার সংগঠনের কিছুই তখন কার্যকর অবস্থায় নেই তবু তিনি আমাদের পথ খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। আমরা যখন এসব প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত তখন পশ্চিম আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর শান্তিরক্ষী বাহিনী (ইকোমগ) এবং এএফআরসি জান্তার মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

এএফআরসি এই যুদ্ধের আগে আরইউএফের সকল যোদ্ধার প্রতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে যোগ দেয়ার আবেদন জানায়। ফলাফল যা-ই হোক না কেন, তাদের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কারণ সামরিক জান্তা শুধু তাদের শক্তিবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার জন্যই সকল প্রকার ন্যায়নীতির জলাঞ্জলি দিয়ে চিরশত্রু আরইউএফের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে! আমার ধারণায় এর রাজনৈতিক ফলাফল রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হতে বাধ্য। কিছু সৈনিক গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে থেকে যাবে আবার একদল সৈনিক বিদ্রোহীদের সাথে মিশে যাবে। এতে এক জটিল সমীকরণের জন্ম হবে। সাধারণ মানুষ এতে আরও বেশি বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কোন দলকে সমর্থন করবে তা তারা বুঝে উঠতে পারবে না। দলীয়করণের আর কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি থাকবে না। এই অরাজকতার সুযোগ নেবে দুষ্ট ও অসৎ লোকেরা। ৪ঠা জুন ১৯৯৭ চারটি ল্যান্ড রোভারে বোঝাই হয়ে একদল মিলিটারি পুলিশ আমার বাসায় ঝটিকা আক্রমণ চালাল এবং কোনো প্রশ্ন না করেই আমাকে বন্দি করে কোকারেলে অবস্থিত প্রতিরক্ষা সদর দফতরে নিয়ে গেল।

কোকারেলে আসার পর আমাকে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এসএফওয়াই কোরওমার অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। জেনারেল আমাকে জানালেন, এএফআরসি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করেই তিনি আমাকে বন্দি করার আদেশ দিয়েছেন। তবে এর মধ্যে কোনো দুরভিসন্ধি নেই। তিনি আরও বললেন, তারা আমার নিকট থেকে যা পেতে চান তা হল তাদের সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা। তাদের সরকারের সাথে আমার কী ভূমিকা হতে পারে সে বিষয়ে আমি কিছু প্রশ্ন করলাম। আমি একথাও জানালাম যে সামরিক কর্মকাণ্ডে আমার আর কোনো প্রকার আগ্রহ নেই। জেনারেল বললেন, আমার বয়স এবং অতীত দুরবস্থা সম্পর্কে তারা সচেতন আছেন। তাছাড়া

BanglaBook.org

আমার প্রতি তাদের যথেষ্ট সম্মানবোধ রয়েছে এবং সেই সম্মানকে রক্ষা ও তাদের সরকারের সাথে ভুল-বোঝাবুঝি দূর করার জন্যই আমাকে ভবিষ্যতে তাদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে হবে। আমি যে একজন সিয়েরা লিয়নি এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন যে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে সরকার ও সেনাবাহিনীর এই অধিকার আছে যে তারা যে কোনো সিয়েরা লিয়নিকে ব্যবহার করবেন।

আমাদের মিটিং শেষ হল এবং পরদিন পর্যন্ত আমি নিরাপত্তামূলক বন্দিত্বের ভিতর থাকলাম। ৫ই জুন সেনা কর্তৃপক্ষ ডিফেন্স কাউন্সিলের একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে এবং সেই সময় আমাকে কনফারেন্স হলে নিয়ে যাওয়া হয়। এএফআরসি চেয়ারম্যান মেজর জনি পল করোমা মিটিংয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললেন যে, ডিফেন্স কাউন্সিলের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সকল সিয়েরা লিয়নিকে সংগঠিত করতে হবে এবং বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে দেশের ভূখণ্ড ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে। মেজর জে পি করোমা আরও বললেন যে, এই সকল উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আরইউএফকে এই বিপ্লবী সরকারের সাথে যোগ দেয়ার জন্য জঙ্গল থেকে ডেকে আনা হয়েছে। যারা ছিল এককালে শত্রু তারা যেন এখন আর ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ না করে। এজন্যই তিনি সকল সিয়েরা লিয়নিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, বিশেষ করে সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য, যে কোনো কারণে যারা চাকরিতে যোগ দিতে পারেনি, সকল চাইল্ড সোলজার, যারা আন্তর্জাতিক বা জাতীয় যে কোনো সংস্থা দ্বারা চাইল্ড সোলজার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এবং যেভাবেই হোক না কেন সৈনিকদের সাথে অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে যারা সক্ষম, তাদের সকলকে অবশ্যই তার সরকার সমর্থিত বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। এছাড়াও তিনি বয়স ও রাজনৈতিক সমর্থন নির্বিশেষে ছাত্র-ছাত্রী, পুরুষ-মহিলা, বালক-বালিকাসহ শারীরিকভাবে যোগ্য সকল সিয়েরা লিয়নিকে পরবর্তী সামরিক নির্দেশের জন্য প্রতিরক্ষা সদর দফতরে সত্বর রিপোর্ট করতে বললেন।

ওখানে বসে এএফআরসি চেয়ারম্যান ও চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের বক্তৃতা শুনতে শুনতেই আমি বুঝতে পারলাম যে তাদের বক্তব্যে আমার বিষয়টাও স্পষ্ট। বক্তব্যের শেষে তারা এই কথার উপরও জোর দিলেন যে, যদি কোনো সিয়েরা লিয়নি তাদের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে, তাদের নিজেদের ঝুঁকি নিজেরাই নিয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। মিটিং শেষ হল। সবাই যখন বের হয়ে যাচ্ছে তখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল করোমা ও কর্নেল এ কে সিসেহ আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আমার সামরিক কর্মকুশলতা ও নৈপুণ্য

BanglaBook.org

আর্মির সিনিয়র অফিসারদের জানা ছিল বলেই এএফআরসি জান্তা আমার সর্বাত্মক সহযোগিতা চাইল। পূর্বেই বলেছি যে, এসব ঘটনা ঘটার অনেক আগেই আমি সকল চাইল্ড সোলজারদের সংগঠন 'এক্স-চাইল্ড সোলজার অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলাম। এতে তিন শতাধিক আরইউএফ যোদ্ধা এবং চার-পাঁচশ মিলিটারি চাইল্ড সোলজার সদস্য হিসেবে ছিল। এদের অধিকাংশকেই দেশের পশ্চিমাঞ্চলে তাদের আত্মীয়-স্বজন অথবা দত্তক পিতাদের সাথে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এছাড়া চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়ার (সিএডবি-উ) ও ইউনিসেফের সহায়তায় আমাকেসহ চাইল্ড সোলজারদের বিরাট এক অংশকে পশ্চিমাঞ্চলের অর্থাৎ রাজধানী ফ্রি-টাউন ও আশেপাশের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ আমার কাছে এসকল চাইল্ড সোলজারের নামীয় তালিকা চাইলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, পরবর্তী সামরিক আদেশের জন্য তাদের সকলকেই তৎক্ষণাৎ প্রতিরক্ষা সদর দফতরে উপস্থিত হতে হবে।

কথাবার্তা শেষে এএফআরসির সেক্রেটারি জেনারেল কর্নেল সিসেহ, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ এবং আমি একটি ভারি কনভয় নিয়ে নিকটস্থ রেডিও স্টেশনে গেলাম। বিবিসির একজন প্রাক্তন ঘোষক হেলটন ফাঈল তখন এটা চালাতেন। সেখানে গিয়ে আমাকে সকল চাইল্ড সোলজারের প্রতি পরবর্তী সামরিক কর্তব্যের জন্য প্রতিরক্ষা সদর দফতরে হাজির হওয়ার আদেশ জানাতে বলা হল। সেক্রেটারি জেনারেল আমাকে বলতে আদেশ করলেন, যে সকল এনজিও চাইল্ড সোলজারদের পড়ালেখার পৃষ্ঠপোষকতা করছিল তাদের পশ্চিম আফ্রিকার শান্তি রক্ষা বাহিনী বা ইকোমগের সামরিক আগ্রাসনের আশঙ্কায় উদ্ধার করে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই যদি তারা নিজেদের পড়ালেখার ব্যাপারে আগ্রহী হয় তাহলে দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের নিজেদেরই উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই লক্ষ্যে দেশকে মুক্ত করার জন্য সকল চাইল্ড সোলজারেরই একযোগে এগিয়ে আসা উচিত। এটাই সিয়েরা লিয়নবাসীর জন্য প্রাথমিক কর্তব্য বলে বর্তমান বিপ্লবী সরকার বিবেচনা করে।

এই ঘোষণার পরপরই আমাকে আবার প্রতিরক্ষা সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হল। এবার সেক্রেটারি জেনারেল ও চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ আমাকে চেয়ারম্যান জনি পলের অফিসে নিয়ে গেলেন। এর মধ্যে আমার আবেদন রেডিওতে কয়েকবার প্রচার করা হয়েছে এবং সরকারপ্রধানও তা শুনেছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, এটাই তারা আমার কাছ থেকে আশা করেছিলেন এবং তিনি আশা করেন যে আমি তার সরকারের সাথে চূড়ান্ত সহযোগিতা চালিয়ে যাব। তিনি আরও বললেন, এনপিআরসি সরকারের মত আমাকে প্রথমে ব্যবহার, পরে

BanglaBook.org

অপব্যবহার এবং সব শেষে পরিত্যাগ করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। বরং যুদ্ধ শেষ হলে তারা সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন যেন আবার স্কুলের পড়াশোনায় আমি ফিরে যেতে পারি এবং এনজিওদের সাহায্য ছাড়াই যথেষ্ট আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে নিজের ইচ্ছামাফিক জীবনযাপনের জন্য স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারি। এই কথাটা আমাকে বারবার শোনানো হল যে আমি মাত্র ১৬ বছরের তরুণ বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বিগত সাত বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত আমার যাবতীয় অভিজ্ঞতার কারণে তারা সকলে এবং আমার সহকর্মীরা আমাকে গুরুত্ব দেয় ও সমীহ করে।

তাই তারা আমাকে ঝুঁকি ও ভুল-বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য আগের মত করেই কাজকর্ম চালিয়ে নিতে উপদেশ দিলেন। আমার কার্যক্রম শুরু করার জন্য আমার মনোবল উন্নত করার লক্ষ্যে আমার হাতে ছয় লক্ষ লিয়ন (তৎকালীন তিন হাজার ডলারের সমমূল্য), ওয়্যারলেস সেট এবং একটি ল্যান্ড রোভার জিপ তুলে দেয়া হল। সত্যি বলতে কি ওই মুহূর্তে আমি এক প্রকার উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। ঘরে ফিরে দেখলাম রেডিওতে আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শতাধিক চাইল্ড সোলজার একত্রিত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাদের সাথে কথা বললাম এবং আস্থা প্রকাশ করলাম যে আমরা আমাদের কার্যক্রমে সফলতা অর্জন করব। আমি এএফআরসি সরকারের ইচ্ছার কথা জানিয়ে বললাম, ওরা আমাদের সাহায্য করতে চায় কারণ গত কয়েক বছরের সরকারগুলো আমাদের অপব্যবহার করেছে। আমার বক্তৃতা শুনে ওরা আমার মতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল। আমি তখন কর্তৃপক্ষকে প্রত্যেক চাইল্ড সোলজারের জন্য হাতিয়ার ও ইউনিফর্ম দিতে বললাম এবং তাৎক্ষণিকভাবেই এসব সরবরাহ করা হল। এবার চিফ অব ডিফেন্স স্টাফকে সাথে নিয়ে আমি তাদেরকে শহরের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করতে শুরু করলাম। অন্যরা 'ডেথ স্কোয়াড'-এর অংশ হিসেবে আমার সাথেই থেকে গেল। তিন দিনেরও কম সময়ের মধ্যে ছয় শতাধিক চাইল্ড সোলজার আমার অধীনে 'অপারেশন ডিফেন্ড দ্য টেরিটরি'র জন্য কাজ করতে সংগঠিত হল। প্রতিদিনই আমরা ফ্রি-টাউন সংলগ্ন কসো টাউনে অবস্থানরত ইকোমগের নাইজেরীয় ঘাঁটির উপর আক্রমণ পরিচালনা করতাম। কিন্তু আমরা তাদের ঘাঁটি থেকে হটাতে পারলাম না। একদিন আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই বিবিসির সাংবাদিক ভিক্টর সিলভারের নিকট থেকে টেলিফোন পেলাম। তিনি জানতে চাইলেন কোন জিনিস আমাকে আবারও সামরিক কর্মকাণ্ডের ভিতরে নিয়ে গেল? জান্তাদের সাথে আমার সম্পর্কের সবগুলো ব্যাপারই আমি তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে আমাদের কথাবার্তা চলল। এই সংলাপের পর আমাকে আর একজন

BanglaBook.org

বিবিসির সাংবাদিক লন্ডন থেকে টেলিফোন করলেন। তিনি আমাকে চাইল্ড সোলজারদের সম্পর্কে বলতে বললেন, কারণ আমি ছিলাম ওই গ্রুপের সভাপতি। আমাদের পুনঃযোগদানের ব্যাপারটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল কি না তা তিনি জানতে চাইলেন। তিনি চাইল্ড সোলজারদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং যেহেতু আমি আগের সরকারগুলোর সাথেও কাজ করেছি তাই তিনি বর্তমান সরকার সম্পর্কে আমার বক্তব্য জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, শতকরা নব্বই ভাগ এনজিও দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে—যারা চাইল্ড সোলজারদের যত্ন নিত; ফলে বেঁচে থাকার জন্য মিলিটারিতে যোগ না দিয়ে তাদের উপায় ছিল না। আমি বললাম, আর্মির ক্ষমতা দখলের কারণ চিহ্নিত করা আমার পক্ষে দুষ্কর কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তাদের হাতে নিশ্চয় কোনো উত্তম কারণ থেকে থাকবে! তাছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তাদের আছে। বিবিসির 'ফোকাস অন আফ্রিকা' অনুষ্ঠানে সেদিন বিকেলেই এই সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

সেদিনই রাত আটটার দিকে আমেরিকা থেকে আমার মামার টেলিফোন পেলাম এবং তিনি আমার বেতার সাক্ষাৎকার শুনতে পেয়েছেন বলে আমাকে জানালেন। তিনি উপদেশ দিলেন আমি যেন এসবের মধ্যে আবারও জড়িত হয়ে না পড়ি। কিন্তু সামরিক কর্মকাণ্ডে আমি তখন এতটা আগ্রহী হয়ে উঠি যে নানা জনের দেয়া উপদেশ আর গ্রাহ্যই করিনি।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি লন্ডন থেকে আমার প্রাক্তন বস ক্যাপ্টেন এস এ জে মুসার টেলিফোন পেলাম। তিনি জানালেন তিনি সিয়েরা লিয়নে ফেরার পরিকল্পনা করছেন এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্তাকে হটিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে আমরা কথাবার্তা বললাম। তিনি তার পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আমাকে জানালেন। কাব্বাহ সরকারের সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি আমাকে জানালেন যে জাতিসংঘ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা বা পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্র সংস্থা এবং কাব্বাহ সরকারের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে তিনি এই কাজ করতে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি আরও বললেন, কাব্বাহ সরকারের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের পূর্বে তাকে তিন মাস ক্ষমতায় থাকতে হবে। তিনি বর্তমান সরকারের সাথে আমার সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে প্রশ্ন করায় আমি তাকে জানালাম যে, যদিও আমি এদের সাথে পুরোপুরি জড়িত আছি তবু আমার পূর্ণ আনুগত্য এখনও তাঁর প্রতিই রয়ে গেছে। তিনি বললেন, ওই মুহূর্ত থেকেই আমি যেন পশ্চিম আফ্রিকান শান্তিরক্ষা বাহিনী বা ইকোমগকে শত্রু মনে না করে মিত্রশক্তি হিসেবেই গ্রহণ করি।

BanglaBook.org

এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন আমি যেন অন্য সৈনিকদের সংগঠিত করি কারণ তিনি টেলিফোনে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। আমি তার নির্দেশ মোতাবেক সব কাজ করলাম। তার ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না কারণ সেনাবাহিনীর তিন-চর্তুথাংশই ছিল তার অনুগত এবং অধিকাংশ জনগণই তাকে পছন্দ করত। তাই আমার প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তিনি যা কিছু পরিকল্পনা করছিলেন তা সফলই হবে। আমার কাছে এক হাজারের বেশি চাইল্ড সোলজার ছিল যারা সুশিক্ষিত ও ডেথ স্কোয়াডের অন্তর্ভুক্ত। ক্যাপ্টেন মুসার সাথে কথা বলার পর থেকেই ডেথ স্কোয়াডের মধ্যে আমাদের অপারেশনের ধরন বদলে গেল। তিনি বলেছিলেন আমি যেন ইকোমগের কাছে গোয়েন্দা তথ্যাদি পাচার করি। তিনি ইকোমগের টাস্ক ফোর্স কমান্ডারকে আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন। কসো টাউনে অবস্থানকারী ইকোমগ ও আমার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হল। ইকোমগের টাস্ক ফোর্সের অবস্থান ছিল লুঙ্গি এয়ারপোর্ট এলাকায়। টাস্ক ফোর্স কমান্ডার হলেন কর্নেল খোবে। এই টাস্ক ফোর্সের অগ্রবর্তী দল ছিল ফ্রি-টাউনের নিকটবর্তী কসো টাউনে। আমি আমার সৈনিকদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, যখনই ইকোমগ এলাকায় যাব আমরা কেবল আকাশের দিকেই গুলি ছুড়ব এবং নাইজেরিয়ানদের সাথে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করার জন্য আমি হেঁটে তাদের ক্যাম্পে চলে যাব।

এক সপ্তাহ পর ইকোমগের ফোর্স কমান্ডার জেনারেল মালু আমাকে লাইবেরিয়া থেকে টেলিফোন করলেন। তিনি কসো টাউনে অবস্থানকারী তার সৈনিকদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। তিনি আমার নিকট একজন লেবাননি ব্যবসায়ীকে পাঠালেন। এই ভদ্রলোক তাদের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। তিনি আমাকে পাঁচ হাজার ডলার দিলেন এবং আমি তা দিয়ে সৈনিকদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র কেনার ব্যবস্থা করলাম। এক পর্যায়ে আমি আর্মি হেড কোয়ার্টারে গেলাম এবং আমার সৈনিকদের জন্য লাগবে এই কথা বলে ২০০ বস্তা চাল তুলে নিলাম। এই চাল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সাবধানে ইকোমগের হাতে পৌঁছে দিলাম। সামরিক জান্তার অগোচরেই আমাকে এই যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। ক্যাপ্টেন মুসা ফ্রি-টাউনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার দ্বিমুখী কার্যকলাপ সম্পর্কে কেউই জানতে পারেনি।

একদিন বিকেলে, আমি সবেমাত্র মেজর জনি পলা করোমার বাসা থেকে ফিরেছি, এমন সময় মুসা টেলিফোন করে জানালেন তিনি কোনাক্রিতে এসেছেন এবং পরদিনই ফ্রি-টাউনে পৌঁছুবেন। পামালাপ এলাকায় গিনি-সিয়েরা লিয়ন বর্ডার থেকে তাকে তুলে আনার জন্য কিছু সৈনিক জোগাড় করতে পারব কি না

BanglaBook.org

তিনি জানতে চাইলেন। একটু পরে মেজর জনি পল করোমা আমাকে টেলিফোন করে বললেন আমি যেন গিয়ে মুসাকে তুলে নিয়ে আসি। মুসা যে মেজর করোমার সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করছেন তা আমার জানা ছিল না। আমি অবাক হলাম। আমার মনে হল, এটা কিছু অবুঝ বালকের অসম্ভব কিছু করতে যাওয়ার মত কাজ। যা হোক, সৈনিকদের একটি বিরাট কনভয় নিয়ে আমি রওনা হয়ে গেলাম। তিনি আসার আগেই আমি কিছু ছেলেকে কয়েকটি কৌশলগত স্থানে মোতায়েন করলাম যেন তিনি আসার সাথে সাথে প্রয়োজন হলে আমরা আক্রমণ পরিচালনা করতে পারি। শতাধিক ছেলেকে দিলাম ইকোমগের সাথে। কিন্তু ওই দিন সেরকম কোনো কিছুই ঘটল না।

মুসা ফ্রি-টাউনে এলেন। চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে পরদিন তিনি অন্য কয়েকজন চাইল্ড সোলজারসহ আমাকে ডাকালেন। আমরা পুরোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম এবং তিনি আমাদেরকে দৃঢ় থাকতে বললেন। অন্যরা চলে গেলে তিনি আমাকে নিয়ে চেয়ারম্যান করোমার বাসায় গেলেন। সেখানে আমরা এসএলএ'র সব ক'জন ঊর্ধ্বতন অফিসারের সাক্ষাৎ পেলাম। তারা সবাই আমার প্রশংসা করলেন। আমার মনে হল, শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। দুই দিন পরের কথা। আমার শোবার ঘরে কিছু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত ছিলাম। এ সময় রেডিওতে হঠাৎ জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পেয়ে আমরা থমকে গেলাম। কারণ আমরা জানতাম চেয়ারম্যান করোমা তখন ভাষণ দেবেন। তিনি এএফআরসি সরকারের সংগঠন সম্পর্কে বললেন। সেক্রেটারি জেনারেল এ কে সিসেহ একখানি জরুরি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনালেন। এতে বলা হল, মুসাকে লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং পররাষ্ট্র দফতরের প্রধান করা হয়েছে। তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান ফুদে সাঙ্কোর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করবেন বলে জানানো হল। এখানে বলে রাখি, সামরিক জান্তা হাত মেলানোর প্রস্তাব দিলে আরইউএফ তা লুফে নিয়েছিল এবং তখন আরইউএফ-প্রধান ফুদে সাঙ্কোকে ডেপুটি চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। সে যা-ই হোক, বেতার ঘোষণা শুনে আমি মনে মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম! তবে একথা ভেবে নিজেকে উৎফুল্ল রাখলাম যে, এটা সম্ভবত জান্তার ভিতর অনুপ্রবেশের একটি পরিকল্পনা এবং এভাবেই ওদের উৎখাত করা সহজ হবে। পরে ইকোমগের টাস্ক ফোর্স কমান্ডার কর্নেল খোকে আমাকে ফোন করে কী হচ্ছে তা জানতে চাইলেন। তিনি মুসার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম, এটা হয়তো জান্তার ভিতর অনুপ্রবেশের জন্য মুসার একটি পরিকল্পনা। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ জেনারেল বললেন, আমি তা মনে করি না। তবে যা-ই হোক না কেন, আমাদের উচিত হবে কী হয়

BanglaBook.org

তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা। আমি বললাম, আমি মুসার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, তিনি যেন ঘণ্টা দেড়েক পর আমাকে টেলিফোন করেন।

নতুন ইউনিফর্ম পরা মুসার সাথে আমার দেখা হল। কাঁধে ঝকঝক করছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেলের র‍্যাঙ্ক। আমি তাকে নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু তিনি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে চেয়ারম্যানের সাথে মিটিং করার জন্য চলে গেলেন। মিটিংয়ের পর তিনি আমাকে কেইপ সিয়েরা হোটেলে নিয়ে গেলেন এবং আমার নিকট তার নতুন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, যদি আমি এখনও তার প্রতি অনুগত থাকি তাহলে তার কথামত কাজ করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই এবং আমাকে ইকোমগের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। আমি মেনে নিলাম। এসময় টেলিফোন বেজে উঠল। তা ছিল ইকোমগ টাস্ক ফোর্স কমান্ডারের ফোন। মুসা টেলিফোন ধরে বললেন, তার হিসাব মোতাবেক বর্তমান জান্তাকে সরানো অসম্ভব ব্যাপার। একথা শুনে টাস্ক ফোর্স কমান্ডার কর্নেল খোবে নিশ্চয় অবাক হয়েছেন! লে. কর্নেল এস এ জে মুসা আরও বললেন, যে কেউ তা চেষ্টা করবে তা হবে দেশটাকে ধ্বংস করা অথবা নিজেকে খুন করার শামিল। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক ও একজন সৈনিক হিসেবে তিনি তা করতে প্রস্তুত নন। স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি মেজর জে পি করোমার সামরিক জান্তার সাথে যোগ দিয়েছেন এবং আগের মতামত থেকে সরে এসেছেন। ইকোমগের সাথে কসো টাউনে যে চাইল্ড সোলজাররা আছে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে কর্নেল প্রশ্ন করলেন। মুসা বললেন, ইকোমগের উচিত হবে ফ্রি-টাউনে ফিরে আসার জন্য তাদের ছেড়ে দেয়া। কিন্তু কর্নেল তাতে সরাসরি 'না' করে দিলেন। মুসা তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিলেন এভাবে যে, ইকোমগের উপর আক্রমণ চালিয়ে এই সকল চাইল্ড সোলজারকে মুক্ত করে আনার মত সামরিক শক্তি তার আছে। এই পর্যায়ে এসে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল। তবে কথাবার্তার সময় তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র ও শান্ত।

গ্রুপের সকল চাইল্ড সোলজারকে নিয়ে আমার বাসায় একটি মিটিং করার জন্য লে. কর্নেল মুসা আমাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের সামনে বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন। মিটিংয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করার পর ইকোমগের সাথে যে সকল চাইল্ড সোলজার রয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠল। জবাবে তিনি বললেন, ওই সকল চাইল্ড সোলজারকে মুক্ত করার দায়িত্ব হবে ডেথ স্কোয়াডের। একথা শুনে উপস্থিত চাইল্ড সোলজাররা আনন্দ প্রকাশ করল। কিন্তু আমি এধরনের পরিকল্পনায় খুশি হতে পারলাম না। কারণ ইকোমগের সাথে অবস্থানকারী পঞ্চাশজনের অধিক চাইল্ড সোলজারের সাথে আমার বন্ধুত্ব সেই এনপিআরসির সময়কাল থেকেই। আমি জানতাম তাদের মুক্ত করা অসম্ভব এবং

BanglaBook.org

মুক্ত করার যে কোনো প্রচেষ্টা হবে তাদের জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। এটা দেখতে পেয়ে মুসা বললেন, 'ভেবো না! সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' ডেথ স্কোয়াডের মনোবল উচু করার জন্য তিনি দশ মিলিয়ন লিয়ন অর্থ দিলেন এবং পূর্বের দেয়া অঙ্গীকার অনুসারে আরও ইউনিফর্ম ও গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি আমাদের কয়েকজনকে গিয়ে এসব সংগ্রহ করে নিতে বললেন। অল্প-অভিজ্ঞ এবং মাদকাসক্ত চাইল্ড সোলজাররা মুসার ঘোষণা শুনে আনন্দ প্রকাশ করে উঠল। এদের প্রত্যেকের বয়স ছিল আঠার বছরের কম। সভা শেষ করে মুসা চলে গেলেন।

আমি দেখতে পেলাম আমার জীবনসংগ্রামের আরেকটি পর্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মতামত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কী তা জানার জন্য আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে ডাকলাম। এরা ছিল আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগত এবং আমি যা বলব তা-ই করতে প্রস্তুত! ইকোমগের সাথে রয়ে যাওয়া আমাদের সহকর্মীদের সম্পর্কে তারাই প্রশ্ন তুলল। এই সময় আমার টেলিফোনটা বেজে উঠল। এটা ছিল টাস্কফোর্স কমান্ডারের ফোন। আমার সাথে কথা বলানোর জন্য তিনি আমার তিনজন চাইল্ড সোলজারকে কাছে ডেকে রেখেছিলেন। এরা ছিল ইকোমগের সাথে রয়ে যাওয়া আমাদের সহকর্মীদের প্রতিনিধি। কর্নেল খোবে চান আমরা সামরিক জান্তার পক্ষ ত্যাগ করে তাদের সাথে যোগ দিই। কারণ তারাই এদেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কাব্বাহ সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করছেন। তিনি আমাকে সবচেয়ে কঠিন কথাটি যেভাবে বললেন তা হল, আমার সহকর্মীরা এখন তার হাতে যুদ্ধবন্দি হিসেবেই আছে এবং তাদের মুক্ত করার একমাত্র পথ হল পুরো ডেথ স্কোয়াড নিয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। এরপর তিনি আমাকে চাইল্ড সোলজারদের একজনের সাথে কথা বলতে বলে টেলিফোনটা তার হাতে দিলেন। আমার ওই বন্ধু বিশ মিনিট ধরেই কেবল কাঁদল কিন্তু কোনো কথা বলতে পারল না। শেষে টেলিফোনটা একটু শক্ত ধরনের আরেকজনের কাছে দিল। সে অত্যন্ত করুণভাবে তাদের প্রতি ইদানীং যে কঠোর আচরণ করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করল। তাদের দিনে মাত্র এক বেলা খেতে দেয়া হয় এবং কেউ পালাতে চেষ্টা করলে তাকে ওখানেই গুলি করে হত্যা করা হয়। সে আরও বলল, এভাবে চলতে থাকলে পরবর্তী মাস নাগাদ তারা সকলে গুলি খেয়েই মরে যাবে। একথা বলার পর সে নিজেও কাঁদতে শুরু করল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাই কথাবার্তা এখানেই শেষ করলাম। আমি কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে মুসার বাসায় গেলাম এবং ইতোমধ্যে যা যা হয়েছে তা তার কাছে সবিস্তারে বললাম। তিনি বললেন, আমাদের বন্ধুদের বাঁচানোর জন্য কিছু একটা করা দরকার! তার চেহারায় আমি যেন প্রতিহিংসার ছাপ দেখতে

BanglaBook.org

পেলাম। তিনি আমাকে বলে দিলেন আর যেন ইকোমগের সাথে যোগাযোগ না করি। তার একথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমি বাসায় ফিরে এলাম। মুহূর্তেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। ভাবলাম আমার চাইল্ড সোলজার বন্ধুদের জীবন রক্ষার স্বার্থেই মুসা ও করোমার জান্তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। দেশের স্বার্থেই এদের সহযোগিতা করা আমাদের উচিত হবে না। আমি ইকোমগের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য ছেলেদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করলাম।

সিয়েরা লিয়নের এই মেয়েটিও চাইল্ড সোলজার

ঘোর বিপদের মুখোমুখি

এই সময় আমি যেন পাগল-প্রায় হয়ে গেলাম। আত্মসমর্পণের পথে প্রয়োজনে এএফআরসি এবং আরইউএফের সাথে যে কোনো প্রকার সশস্ত্র মোকাবেলার জন্যও আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমার বন্ধুদের মধ্যে যারা আমার এই পরিকল্পনার সাথে অমত পোষণ করল তাদের কথা আমি মুহূর্তেই বাতিল করে দিলাম। কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে আন্দাজ করতে শুরু করল যে, আমি বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় লে. কর্নেল এস এ জে মুসা আমাকে এবং আমার দেহরক্ষীদের সবাইকে সদর দফতরে রিপোর্ট করতে নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু একজন সুশিক্ষিত সৈনিক এবং ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে একথা আমার বুঝতে বাকি রইল না যে তারা আমাকে বন্দি করতে চাচ্ছেন। আমি তাই সে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলাম। রাত বারোটা নাগাদ দুখানা ল্যান্ড রোভার জিপে ভর্তি হয়ে একদল সৈনিক আমার বাসায় এল এবং আমাকে জানাল যে, তারা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের নিকট থেকে আমাকে বন্দি করার আদেশ নিয়ে এসেছে। কিন্তু তারপরও আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম। তারাও জানত যে, আমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা ফিরে গেল। আমি তখন লুঙ্গিতে ইকোমগ টাস্ক ফোর্স কমান্ডারকে টেলিফোন করে জানালাম, আমি যে কোনো মুহূর্তে এএফআরসির সাথে সংঘর্ষ আশা করছি। আমি জানতে চাইলাম এই সংঘর্ষের সময় তিনি আমার জন্য কিছু করতে পারেন কি না। তিনি বললেন, তার পক্ষে যে কোনো কিছুই করা সম্ভব। তবে তিনি উপদেশ দিলেন আমি যেন গণ্ডগোল এড়িয়ে চলি এবং আমাকে বন্দি করার প্রচেষ্টাতে ওদের বাধা না দিই।

তার সাথে কথা বলার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, বাধা দিতে যাওয়াটা আমাদের জীবনের উপর শুধু বিপদই ডেকে আনবে। এতে আমাদের সহকর্মীদের সাহায্য বা রক্ষা করা হবে না। ভোর ছয়টা নাগাদ আমি আমার সতর্ক পাহারায় প্রস্তুত বন্ধুদের সব রকম মোকাবেলা এড়িয়ে চলার উপদেশ দিলাম। বলে দিলাম কেউ আমাদের বন্দি করতে চাইলেও বাধা দেয়া হবে না। সকাল আটটা নাগাদ পাঁচ শতাধিক নেশাগ্রস্ত ও রক্তলোলুপ সৈনিক এবং বিদ্রোহী আমার বাসার উপর ঝটিকা আক্রমণ চালাল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমরা প্রতিরোধ করব কিন্তু এই প্রতিরোধের ফলে প্রচুর গুলি ছোড়াছুড়ি হবে এবং এতে আমাদের চারদিকের

BanglaBook.org

বেসামরিক লোকদের সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে আমার প্রায় সত্তরজন সহকর্মীকে শান্ত থাকতে বললাম। কিন্তু সৈন্য ও বিদ্রোহীরা এগোতে এগোতে গুলি চালাতে শুরু করল। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে আমরা একটি গুলিও না ছোড়ায় আমার মাত্র ছয়জন বন্ধু ওদের হাতে মারা পড়ল। ওরা যখন আমাদেরকে বন্দি করতে শুরু করল তখন আমাদের এক বন্ধু আপন সহকর্মীদের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে হঠাৎ এলএমজি দিয়ে ব্রাশফায়ার শুরু করে। ফলে সাথে সাথেই তিরিশজন সৈনিক মারা গেল। অবশ্য এতে আমার আরও দুজন সহকর্মী প্রাণ হারায়। তাকেও ওদের একজন গুলি করে হত্যা করে। বন্দি করে আমাদের প্রথমে সদর দফতরে এবং পরে পাদেমবা রোড কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা শাস্তি ঘোষণা করা হল না।

কয়েকদিন পর তারা আবার আমাদের কারাগার থেকে সদর দফতরে নিয়ে গেল এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের অভিযোগ আনল, যা ছিল অভ্যুত্থানের নীল-নকশা প্রণয়নের সমান অপরাধ! কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই আমাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোষণা দেয়া হল। আমার তিন বন্ধু এবং আমি এর মধ্যে ছিলাম। অন্য বন্দিদের কারাগারেই রাখা হয়েছিল। আমাদেরও পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা হল। তবে সাধারণ কয়েদি হিসেবে নয়, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে কনডেম সেলে থাকার জন্য! তখনও পর্যন্ত মেজর কুলা সাম্বা আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারেননি। তিনি ছিলেন আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী এবং 'জেন্ডার অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার বিভাগের দায়িত্বশীল। অতীতে তিনি বরাবরই আমাকে সাহায্য করে এসেছেন। একদিন তিনি অন্য সমাজকর্মীদের সাথে কারাগার পরিদর্শনে এসে আমাকে দেখতে পান। চলে যাওয়ার আগে তিনি আমার সেলে একখানি চিঠি রেখে যান। এর মাধ্যমে তিনি আমাকে জানিয়ে দেন, আমাকে মুক্ত করার ব্যাপারে এখনও তেমন কিছুই করতে পারেননি; তবে তিনি নিশ্চিত করবেন যেন আমাকে হত্যা করা না হয়।

সামরিক জান্তার বিরোধিতা করার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড জারির মত অঘটন ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও আমার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, আমি মরব না। তবে কনডেম সেলে থাকতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। প্রত্যেকটি দিন ছিল তার পূর্বদিনের চেয়ে খারাপ। কখনও কখনও পুরোটা দিন ধরেই আমি কাঁদতাম। একদিন কয়েকজন সৈনিক কারাগারে এল এবং মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কিছু সৈনিককে নিয়ে গিয়ে সবার সামনেই গুলি করে হত্যা করল। তা দেখে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। আমার মনে হল, ওরা ওদের ইচ্ছামত যে কোনো মুহূর্তেই এসে আমাকে হত্যা করতে পারে! আমি আমার জীবন-রক্ষার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে

BanglaBook.org

আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলাম। আমি তার কাছে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি এই বিপদ থেকে এবার আমার জীবন রক্ষা পায় তাহলে আমি ভবিষ্যতে সকল প্রকার সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখব। সৃষ্টিকর্তা প্রভুর উপর আমার ভীষণ অভিমানও হচ্ছিল সন্দেহ নেই। এমনকি এক পর্যায়ে আমি এমনও ভাবলাম, প্রভু বলে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে সেই প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করেন না। তা না হলে তিনি কেন আমার সরল-সোজা পিতা-মাতাকে হত্যা করার সুযোগ বিদ্রোহীদের দিলেন? কেনইবা আমাকে এত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হল? অবশেষে এখন আমি নিজেও মৃত্যুর জন্য কারাগারে দিন গুনছি! ওটা ছিল আমার জন্য কঠিন সময়। আবার সৃষ্টিকর্তার দয়ার কথা ভেবে আমি মনে মনে এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ করতাম। তাই কারাগারের হতাশাপূর্ণ জীবন সত্ত্বেও আমি প্রার্থনা করে গেলাম। আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখপূর্ণ সময় ছিল এই কারাগারের জীবন! কারাগারে বন্দিদের সকলেই ছিল ভীষণ হতাশ। সব বয়সের কয়েদিরাই প্রতিদিন খুব কান্নাকাটি করত।

কারাগারে আমার অবস্থানের তেইশ দিনের মাথায় এক রাতে একজন মহিলা কারা-অফিসার আমার সেলে এলেন। সমগ্র কারাগারে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে কম বয়স্ক। এএফআরসি কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেয়া ৫৩ জন বন্দির মধ্যে ৪০ জন সৈনিকের আমিও ছিলাম একজন। অথচ তখনও আমার ১৭তম জন্মদিন আসেনি! ভদ্র মহিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে আমাকে কারাগারে আসতে হল এবং মৃত্যুদণ্ড পেতে হল! আমি আমার জন্ম থেকে শুরু করে ওই দিন পর্যন্ত আমার জীবনের পুরো কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি খুব আবেগতাড়িত হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি জানি তিনি আমার জন্য বেদনা অনুভব করছিলেন। এমন সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে এক পর্যায়ে আমিও কাঁদতে শুরু করলাম। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তিনি নিশ্চিত করবেন আমি যেন মারা না যাই আর চেষ্টা করবেন আমি যেন কারাগার ছেড়ে পালাতে পারি। অবিশ্বাসের সাথে বললেন, এতে তার চাকরি বা জীবনের পরোয়া তিনি করেন না। তিনি আমাকে কান্না বন্ধ করতে বলে চলে গেলেন। কিন্তু আমাকে মুক্ত করার ব্যাপারে তার দেয়া আশ্বাসের উপর আমি কোনো ভরসা পেলাম না। সেই দিনগুলোতে তার নাইট ডিউটি ছিল বলে রাত্রিবেলা যখনই তিনি কাজে আসতেন তখনই আমাকে একবার দেখে যেতেন।

কোনো সেলে দরজা খোলার শব্দ হলেই আমি ভীষণ ভয় পেতাম। কারণ এভাবেই সৈনিকরা যখন-তখন এসে লোকদের হত্যা করার জন্য নিয়ে যেত।

BanglaBook.org

লোকগুলো চিৎকার আর কান্নাকাটি করত যতক্ষণ না সৈনিকরা ধমক দিয়ে তাদের থামিয়ে দিত। পরবর্তী রাতে তিনি এসে আমার সেলে প্রবেশ করলেন। আমার সেলে কোনো আলো ছিল না, ওটা ছিল অন্ধকারে পরিপূর্ণ। তিনি একটি বড় টর্চ লাইট নিয়ে এসেছিলেন। প্রায় নিঃশব্দে আমার নাম ধরে ডেকে বললেন তিনি এসেছেন। তার গলা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। আমার পরনে ছিল আর্মি ইউনিফর্ম। তিনি বললেন, সারা দিন একটি সম্ভাব্য কিন্তু কঠিন সমাধান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তিনি ভাবছিলেন একজন কারা-অফিসারের পোশাক পরে এই কারাগার থেকে হেঁটে বের হয়ে যাওয়াটাই আমার মুক্তির একমাত্র সম্ভাব্য পথ। তবে এটি হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি কাজ। কারণ আমি যদি ধরা পড়ি ওরা সরাসরি আমাকে মেরে ফেলবে। আর যদি আমি পালিয়ে যেতে সফল হই এবং তাকে ওরা সন্দেহ করে তাহলে তাকেই ওরা মেরে ফেলবে। কিন্তু যদি তাকেও সন্দেহ করা না হয় তাহলে ওই সময় ডিউটিরত সকলকেই প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করতে হবে। ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও তেইশ বছর বয়স্কা ওই ভদ্র মহিলা আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি বললেন, আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে তার মৃত্যু হলেও তা নিয়ে তিনি ভাবেন না। এসময় তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন কারাগার থেকে বের হয়ে গিয়ে আমি কী করব? আমি বললাম, আমি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব। তিনি জানতে চাইলেন আমি এসব কাহিনীর কথা লিখে রাখব কি না? কারাগারে আমার দীর্ঘ পঁচিশ দিনের মধ্যে এই প্রথমবার আমি হেসে উঠলাম। আমি হাসলাম কারণ আমি যেখানে কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ারই কোনো সম্ভাবনা দেখছিলাম না, তখন তিনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন আমি বাইরে গিয়ে কী করব। আসলে একজন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে ওই ভদ্র মহিলার এত কান্নাকাটি এবং সকল প্রকার সহানুভূতিমূলক কথার একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার মনে হয়েছে জেল থেকে আমার পালিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না সেটাই তিনি জানতে চাচ্ছেন।

এক পর্যায়ে আমি সরাসরি তাকে জানিয়ে দিলাম যে আমি তাকে বিশ্বাস করি না। আমি বললাম, কারাগার ছেড়ে যাওয়ার আমার কোনো পরিকল্পনা নেই এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি। এরপর আমরা দুজনেই দীর্ঘ সময় ধরে নীরব রইলাম। নীরবতা ভঙ্গ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি খ্রিস্টান কি না? আমি হ্যাঁসূচক জবাব দিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু যে আমাকে কারাগার থেকে রক্ষা করতে পারেন তা আমি বিশ্বাস করি কি না? আমি বললাম, আমি বিশ্বাস করি তবে সন্দেহ হচ্ছে এটা কীভাবে বাস্তবায়িত

BanglaBook.org

হতে পারে। জবাবে তিনি বললেন, প্রার্থনার মাধ্যমেই এটা সম্ভব। তিনি বললেন, প্রভুর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। এরপর তিনি আমাকে তার সাথে প্রার্থনায় যোগ দিতে বললেন। আমরা এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে প্রার্থনা করলাম এবং এরপর তিনি চলে গেলেন।

প্রার্থনাটা আমার জন্য ভালোই হয়েছিল কারণ আমি ছিলাম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, হতোদ্যম এবং নিদারুণভাবে বিরক্ত। আমি ছিলাম এতটাই অসহায় যে কনডেম সেলের মধ্যে আমার বিভ্রান্তিকর এবং চরম দুঃখজনক অবস্থার কথা আমি কোনোদিন লিখে বা বলে প্রকাশ করতে পারব না। ভেবে দেখুন, আমি ছিলাম যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার অবস্থায় পতিত একজন বালক! পরদিন রাত্রিবেলা তিনি আবার এলেন এবং আমাকে একটি বাইবেল ও টর্চ লাইট দিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে এই পবিত্র গ্রন্থ থেকে প্রার্থনা সঙ্গীতটি বারবার পাঠ করতে বলেন। তিনি বললেন প্রার্থনার সময় আমি যেন এই কথার উপর বিশ্বাস রাখি যে, আমার এই পরিস্থিতির অবসান হবেই। তিনি আমাকে তিন দিন ধরে উপবাস পালন ও প্রার্থনা চালিয়ে যেতে বলেন। এই ক'দিন তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। তিনি আমাকে কারও সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন এবং মনোযোগ দিয়ে ওই তিন দিন প্রার্থনা করতে ও বাইবেল পড়তে বলেন। আমি তার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। চতুর্থ রাত্রিতে এসে তিনি জানালেন যে ওই রাত্রেই আমাকে কারাগার ত্যাগ করতে হবে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমার আত্মবিশ্বাস আছে কি না? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। আমার সামরিক প্রশিক্ষণ, আমার উপর আপতিত বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং এই ক'দিনের প্রার্থনার কারণে আমি অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তার হাতে একটি কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিল। তিনি ওটা থেকে কারা-অফিসারদের ব্যবহৃত এক জোড়া ইউনিফর্ম বের করে আমাকে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তা পরে নিলাম। তিনি আমাকে বাইবেলের তেইশ নম্বর স্তব পাঠ করতে বললেন। আমি পড়া শেষ করার পর তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমি তাকে মনে রাখব কি না জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, আমার জীবনের ইতিহাসে তার জন্য একটি সম্মানজক স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। এরপর তিনি আমাকে বেরিয়ে পড়ার অনুমতি দিলেন। কারাগারের কনডেম সেল ছেড়ে বাইরের প্রধান সড়কে ওঠার আগে আমাকে চার চারটি গেট অতিক্রম করতে হয়েছিল। তিনটি গেট অতিক্রম করার সময় কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তারা আমাকে বিনাবাক্যে গেট খুলে দিয়েছিল কারণ আমার পরনে ছিল একজন সার্জেন্ট পদবির কারা-কর্মকর্তার পোশাক। চতুর্থ গেটের দারোয়ান চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছিল। উজ্জ্বল আলোর নিচে লোহার তৈরি বিশাল ওই গেটে চারটি ভিন্ন প্রকারের তালা লাগানো ছিল। আমি

BanglaBook.org

তখন মুহূর্তেই একটি বুদ্ধি বের করলাম। তার কাছে গিয়ে খুবই আত্মবিশ্বাস নিয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঘুমাচ্ছ? গেট রক্ষক লাফিয়ে উঠল এবং র‍্যাঙ্ক দেখতে পেয়ে বলল, না স্যার! সে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি বাইরে যাবেন স্যার? আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ। সে তখন ইন-আউট রেজিস্টারটা সই করার জন্য আমার সামনে রেখে নিজে দরজা খুলতে ছুটে গেল। রেজিস্টারটা ফেরত নিয়ে সে আমাকে খুব কড়া একটি স্যালুট করল এবং বলল, থ্যাংক য়্যু স্যার! মুখ অন্যদিকে রেখেই গম্ভীর জবাবে আমি বললাম, ইউ আর ওয়েলকাম। অবশেষে আমি জেলখানার বাইরে পা রাখলাম। এটা হল সিয়েরা লিয়নের সর্বাধিক নিরাপত্তার জন্য কুখ্যাত কারাগার। কারাগারের চতুর্দিকেই রাস্তাগুলোতে বাড়তি সৈনিক মোতায়েন করা ছিল। আমি তাদের মধ্য দিয়ে হেলে দুলে হেঁটে গেলাম। যখনই আমি কাউকে 'হ্যালো!' বলি তারা জবাব দেয়, সার্জেন্ট! হাউ আর ইউ স্যার? এভাবে একসময় আমি এলাকার বাইরে চলে এলাম। সে রাতের কথা ভাবতে এখনও আমার স্বপ্নের মত লাগে।

আমি আমার বান্ধবীর বাসায় গেলাম। সে এবং তার পরিবার আমাকে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু আমার জেল-পালানোর কাহিনী শোনার পর সম্ভাব্য মৃত্যু-পরিণতির কথা চিন্তা করে ওরা সকলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। আমি তাদেরকে দুশ্চিন্তা না করতে বলে জানালাম যে আমি সেখানে থাকতে বা ঘুমাতে যাইনি। তার মা জানতে চাইলেন, আমি কোথায় যাব? আমি বললাম, আমি গিনির দিকেই যাব। তার মা তখন বেডরুম থেকে আমার জন্য কিছু টাকা নিয়ে এলেন। আমার বান্ধবী তখন কাঁদছিল। সে জানতে চাইল, আমি কারা-অফিসারের ইউনিফর্ম বদলাব কি না? আমি বললাম, না। টেলিফোন নিয়ে আমাদের একজন চাইল্ড সোলজারের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং আমাকে তুলে নিয়ে যেতে বললাম। ওরা ঝটিকা বেগে আমার কাছে ছুটে এল এবং আমাকে এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে আমার জন্য একজোড়া মিলিটারি ইউনিফর্ম নিয়ে আসতে গেল। আমাকে বন্দি করার পর আমার দলের চাইল্ড সোলজারদের অধিকাংশকেই শহরে মোতায়েন করা হয়। এই সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের খুব তাড়াতাড়ি সংগঠিত করে ফেলে। ৪০ জনেরও বেশি চাইল্ড সোলজার আমার কাছে চলে এল। তখন রাত তিনটা। ওরা আমার কাছে পরবর্তী পরিকল্পনা জানতে চাইল। আমি জানালাম আমি গিনির উদ্দেশে যাত্রা করতে চাই। ওরা বলল, তারা আমার সাথে সবকিছু করতে এমনকি মরতেও রাজি! আমি তাদেরকে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করতে বললাম। ওরা একটি ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি এবং একটি টয়োটা হাইলাক্স নিয়ে ফিরে এল। ওরা ছিল সশস্ত্র। তারা একজন লেবানিজ ব্যবসায়ীর বাসার দিকে গাড়ি চালাল, যিনি ছিলেন

BanglaBook.org

ইকোমগের গোয়েন্দা এবং আমার সাথে অনেক গোয়েন্দাকর্ম করেছেন। আমার অবস্থার কথা পুরাপুরিভাবেই তার জানা ছিল। আমি কী করব তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, গিনি যাব। তিনি আমার হাতে দু'হাজার ডলারের নোট তুলে দিলেন। ওদিকে আমার বন্ধুরা আমাকে সীমান্ত পর্যন্ত এসকর্ট করার জন্য তৈরি হয়ে ছিল। আমি তখন কোনো কিছুকেই ভয় পাচ্ছিলাম না, কারণ আমি জানতাম এবার আমি হয় বাঁচব না হয় মরব!

ভোর ছয়টার সময় আমরা সীমান্তের উদ্দেশে শহর ত্যাগ করলাম। আমি ছিলাম সেনাবাহিনীতে বহুল পরিচিত তবে রাজধানীর বাইরে অধিকাংশ সৈনিকই ফ্রি-টাউনে আমার বন্দি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানত না। তাই ফ্রি-টাউন থেকে কাম্বিয়া ডিস্ট্রিক্ট পর্যন্ত পৌঁছতে আমরা কোনো বাধা পেলাম না। আমরা যখনই কোনো চেকপোস্টে পৌঁছাই সৈনিকরা আমাকে স্যালুট করে যাওয়ার জন্য রাস্তা খুলে দেয়। এটাও সত্যি যে, আমাদের যাওয়ার পথে যে কোনো রকম আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আমি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। ওই সময় আমি ছিলাম অত্যন্ত কঠোর ও দৃঢ়সঙ্কল্প! কাম্বিয়া অতিক্রম করার পর সীমান্ত-পোস্টে আমাদের থামানো হল। এই চেকপোস্টে সৈন্য ও বিদ্রোহী উভয় দলই ছিল। কারণ এরই মধ্যে আরইউএফ বিদ্রোহীরা সরকারি সৈন্যদের সাথে কাজ করতে শুরু করেছিল। আমি কোথায় যাচ্ছি তা ওরা জানতে চেয়েছিল। কারণ ওরা সচেতন ছিল যে একদল সৈন্য যারা সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে না তারা দেশ ত্যাগ করার চেষ্টা করতে পারে। ওরা তাই আমার ব্যাপারেও একই কথা ভাবছিল হয়তোবা।

নিরেট মিথ্যা বলে ওদের বোকা বানানোর মত যথেষ্ট বুদ্ধি আমার ছিল। আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে ওদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে জানালাম, রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাপ্রধান সীমান্ত অতিক্রম করে গিনির কমান্ডারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হস্তান্তর করার ব্যাপারে আমাকে নির্বাচন করেছেন। এই কথার উপর বাধা দেয়ার মত হিম্মত তাদের ছিল না। ওরা আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে দিল। কিন্তু তাতেও বিপদ কাটল না। গিনিয়ানরা তাদের দিকের চেকপোস্টে আমাদেরকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে থামিয়ে দিল। তাই আমি থামলাম এবং আমার দুজন সঙ্গীসহ গাড়ি থেকে নেমে সৈন্যদের দিকে এগিয়ে গেলাম। তখনও আমাদের দিকে ওদের বন্দুক তাক করা ছিল। ওরা আমাদের পরিচয় জানতে চাইল। আমি নিজের সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। ওদিকে আমরা ওখানে পৌঁছানোর আগেই ইকোমগের গোয়েন্দা সেই লেবানিজ ভদ্রলোক মনরোভিয়ায় ইকোমগ কমান্ডারকে জানিয়েছিলেন তিনি যেন গিনির রাজধানী কোনাক্রিতে প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর প্রবাসী সরকারের মাধ্যমে গিনির কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের আসার

BanglaBook.org

ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। তাই গিনির সৈনিকরা আমাদের আসার ব্যাপারে জানত। তবু তারা আমাদেরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল। ওরা শুধু আমাকেই কোনাক্রিতে প্রবেশের অনুমতি দিল এবং কোনাক্রির আর্মি কমান্ডারের নির্দেশ পেলেই কেবল আমার অন্য সহকর্মী সৈনিকদের গিনিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে রাজি হল। আমি আমার সহকর্মীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে সীমান্তে রেখে এলাম এবং একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে কোনাক্রি রওনা হলাম। আমার সাথে এসকর্ট হিসেবে দুজন গিনিয়ান সৈনিক ছিল। ওই দিন বিকেল পাঁচটায় আমরা কোনাক্রি পৌঁছলাম এবং সরাসরি সিয়েরা লিয়ন দূতাবাসে গিয়ে ওখানে কাউকে পেলাম না। এদেশে আমি প্রথম এসেছি, যেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই বা কারও ভাষাও আমি বুঝি না। তাই সৈন্য দুজন আমাকে একটি হোটেলে রেখে নিজেদের কাজে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। শেষে ওরা আমাকে নোভোটেল হোটেলে নিয়ে গেল, যেখানে আমি দীর্ঘদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেলাম।

নিকারাগুয়ার চাইল্ড সোলজাররা বড়দের সাথে একই ট্রাকে

প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর সাথে সাক্ষাৎ

১৯৯৭ সালের ২৮শে জুলাই সকালে আমি নোভোটেল হোটেলের রুম থেকে বের হলাম। দূতাবাসে গেলাম সিয়েরা লিয়নের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। রাষ্ট্রদূত জাব্বি ছিলেন নৌবাহিনীর এক জন প্রাক্তন অফিসার। ক্যাপ্টেন এসট্রেসারের এনপিআরসি সামরিক সরকারের আমল থেকেই তিনি আমাকে জানতেন এবং সিয়েরা লিয়ন সরকারের সাথে আমার কার্যকলাপের ঘনিষ্ঠতার খবর রাখতেন। তিনি আমার আসার খবরও জানতেন। সকাল আটটায় তার সাথে দেখা হতেই তিনি বললেন, ফ্রি-টাউনে আমার উপর যা যা ঘটেছে তার সবই তিনি জানেন এবং এ ব্যাপারে তাকে কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, আমার আসার আগেই তিনি এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর সাথে আলোচনা করেছেন। এরপর রাষ্ট্রদূত জাব্বি প্রেসিডেন্টের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন।

সেদিন দুপুর বারোটা নাগাদ আমরা প্রেসিডেন্ট লজের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। সিয়েরা লিয়নের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আজ নিজ দেশের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কারণে প্রতিবেশী দেশে এসে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন! তিনি কাজ করছেন প্রবাসী সরকারের মাধ্যমে। আমাকে প্রেসিডেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। প্রেসিডেন্ট আমাকে স্বাগত জানিয়ে শেকহ্যান্ড করে বসতে বললেন। শুরুতেই রাষ্ট্রদূত জাব্বি আমার কিছু কিছু ঘটনা প্রেসিডেন্টের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। পরে আমাকেই সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলতে বললেন। প্রথমে আমি কীভাবে সৈনিক হলাম তা ব্যাখ্যা করলাম। এরপর আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা বর্ণনার পর জেল থেকে পালিয়ে গিনিতে আসার কাহিনী শোনালাম। আমার গল্প শুনে প্রেসিডেন্ট অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ কোনো শব্দোচ্চারণ না করে নীরব হয়ে বসে রইলেন। এরপর আমার পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, আমি স্কুলে ফিরে যেতে চাই। তিনি বললেন, সেটা অতি উত্তম কথা!

এ পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত জাব্বি আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে বললেন, তিনি আমার সাথে ফ্রি-টাউনে অপারেশনের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং আমি লাইবেরিয়ায় অবস্থানরত ইকোমগের ফোর্স কমান্ডার

BanglaBook.org

জেনারেল মাল্লুর সাথে ছেদহীন যোগাযোগ রক্ষা করেছি। তিনি প্রস্তাব করলেন দেশের স্বার্থেই ইকোমগের অপারেশনের সাথে আমার সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। এরপর হয়তো সরকার স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে আমার স্কুলে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কিছু একটা করতে পারবে। তিনি বললেন, গিনিতেই আমার স্কুল শুরু করার ব্যাপারটা অসম্ভব না হলেও কষ্টকর হবে, কারণ প্রথমত গিনি হচ্ছে ফরাসি ভাষাভাষী দেশ এবং প্রেসিডেন্টের সরকারও এখানে অস্থায়ীভাবেই আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে এখনই কিছু করার প্রয়োজন হবে না। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত জাব্বির ধারণাকে অত্যন্ত চমৎকার হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে এ ধারণাটা কেমন লাগল তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, মন্দ নয়! কারণ এএফআরসি জান্তার সাথে আমার বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমার সহকর্মীদের মুক্ত করার জন্য ইকোমগের কাছে আত্মসমর্পণ করা। তখন আমি প্রেসিডেন্ট কাব্বাহকে বললাম, আমি আমার প্রায় ৩৮ জন চাইল্ড সোলজারকে সাথে নিয়ে এসেছি যাদেরকে গিনির কর্তৃপক্ষ সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

তার টেলিফোন ব্যবহার করে আমি লুঙ্গিতে অবস্থানকারী ইকোমগ টাস্ক ফোর্স কমান্ডারের সাথে কথা বলার জন্য তার অনুমতি চাইলাম। আমি যেন আমার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে জানাতে পারি যে আমি কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছি। প্রেসিডেন্ট অনুমতি দিলেন। আমি কর্নেল খোবেকে টেলিফোনে জানালাম যে আমি কোনাক্রি থেকে কথা বলছি। প্রথমেই কর্নেল সাহেব আমাকে কনগ্রাচুলেট করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন আমি কি বুঝতে পেরেছি আমি কত বড় কাজ করেছি! একজন সুপ্রশিক্ষিত এবং ভাগ্যবান সৈনিক জীবনে এ ধরনের কাজ একবারই করার সুযোগ পায় বলে তিনি আনন্দের সাথে মন্তব্য করলেন। আমি তাকে আমার যে কোনো একজন বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ দিতে অনুরোধ করি। তিনি ওখানেই ওদের একজনকে ডাকলেন। সে আমাকে জানাল যে ওদের জীবন বাঁচানোর জন্য কাজ করতে গিয়ে আমি যে বন্দি হয়ে কারাগারে আছি একথা কর্নেল খোবে জানতে পারার পর থেকে তাদের উপর কঠোর ব্যবহার হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেছে। বরং তারা এখন ওদের কাছ থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ লাভ করছে। ছেলেটি আরও জানাল, আমার বিপদের সংবাদই ওদের জন্য বেশি কষ্টদায়ক ছিল; এখন আমি যে মুক্ত হয়ে বেঁচে আছি তাতেই তারা সবচেয়ে বেশি সুখী! সে আরও বলল, টাস্ক ফোর্স কমান্ডারের মুখে আমার মুক্তির কথা শুনে ওদের অনেকেই তা বিশ্বাস করতে পারছে না! সুতরাং আমি বুঝে নিলাম এখন আমার প্রয়োজন যত শীঘ্র সম্ভব তাদের সাথে গিয়ে যোগ দেয়া। টেলিফোনটা রেখেই প্রচণ্ড উত্তেজনায় অবচেতনভাবে আমি লাফিয়ে উঠলাম এবং

BanglaBook.org

চিৎকার করে বললাম, 'ওরে বাহ্! যা চেয়েছিলাম আমি তা করতে পারলাম!' আমি তিন তিনবার এ কথাগুলো বললাম। প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রদূত এবং আরও যে ক'জন এই আলোচনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই কেবল নীরবে মাথা নাড়লেন। আমার বন্ধুদের জীবন বাঁচাতে পেরে আমি যে মহাখুশি এটা তারাও বুঝতে পারলেন।

শেষে আমার অন্য সহকর্মীদের সীমান্ত থেকে কোনাক্রিতে নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন, ইকোমগের ফোর্স কমান্ডার জেনারেল মালু তার সাথে দেখা করতে যখন কোনাক্রিতে আসবেন তখন আমিও যেন তার সাথে দেখা করি ও প্রয়োজনীয় আলোচনা করি। শেষে তিনি আমাকে কিছু টাকা দিলেন এবং আমার হোটেলের বিল মিটিয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দিলেন। আলোচনা শেষে আমরা দূতাবাসে ফিরে এলাম। রাষ্ট্রদূত সলোমন মুসা নামে একজন পুলিশ অফিসারের সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন সিয়েরা লিয়নে প্রধান ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে গিনিতে নির্বাসনে আছেন। মি. সলোমন মুসা ছিলেন ফ্রি-টাউনে প্রস্তাবিত সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সকল সরকারি খরচপত্রের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আমার কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করা হল। যেহেতু প্রেসিডেন্ট তাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই খুব বেশি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়নি। সলোমন আমাকে হোটেল কামেয়েন্নেতে যেতে বললেন, যেখানে তিনি নিজেও অবস্থান করছিলেন। এদিকে বিকেল পাঁচটা বেজে যাচ্ছিল; ওটা ছিল রাষ্ট্রদূতের অফিস শেষ করার সময়। তাই তিনি আমাকে সলোমনের সাথে গিয়ে আমার থাকার ব্যাপারে সুরাহা করতে বললেন। প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর নিরাপত্তার জন্য গিনি সরকার একজন গিনিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেনকে নিযুক্ত করেছেন। তাকেই সাথে নিয়ে সীমান্তে রেখে আসা আমার সহকর্মীদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই গিনিয়ান আর্মির চিফ অব স্টাফের সাথে দেখা করার জন্য রাষ্ট্রদূত চলে গেলেন। সলোমান মুসা এবং আমি কামেয়েন্নে হোটেলে গেলাম। তিনি আমার জন্য একটি রুম ভাড়া করলেন। পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই আমার সাথে ছিল না। মুসা তাই তার ড্রাইভারকে পাঠিয়ে আমার জন্য কিছু কাপড়-চোপড় আনিয়ে নিলেন। এভাবে সবকিছু ভালোই যাচ্ছিল এবং সে রাতে আমরা ফ্রি-টাউনে সামরিক জান্তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললাম।

সকাল বেলা আমরা হোটেল ছেড়ে দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করলাম। সেখানে আমি দেখতে পেলাম কিছু গিনিয়ান সৈনিক একটি সামরিক ট্রাক নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমরা যেন আমার সহকর্মীদেরকে

BanglaBook.org

সীমান্ত থেকে নিয়ে আসতে পারি। আমরা গাড়ি নিয়ে পামালাপ গেলাম এবং সব চাইল্ড সোলজারকে ট্রাকে তুলে নিলাম। বন্ধু আবুবকর জাওয়াদকে সাথে নিয়ে আমি একটি সামরিক কারে চড়ে ওদের আগে আগে রওনা হলাম। কোনাক্রিতে পৌঁছে ওদের থাকার ব্যবস্থা করা হল। আমি ও আবু গিয়ে হোটেলে উঠলাম। পরদিন সকালে আমি, আবু এবং সলোমন রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্টের দেয়া প্রস্তাব অনুযায়ী জেনারেল মালুর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেসিডেন্ট লজে গেলাম। সেখানে আমরা জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট কাব্বাহ সরকারের সিনিয়র অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। প্রকৃতপক্ষে ফ্রি-টাউনের সামরিক জান্তাকে উৎখাতের জন্য সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়ে একটি মিটিংয়ে আমাদেরকে যোগ দিতে হল। মিটিংয়ের পর প্রেসিডেন্ট কাব্বাহ আমাকে জেনারেল মালুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জেনারেলের সাথে আমি টেলিফোনে বরাবরই যোগাযোগ রক্ষা করেছি কিন্তু কখনও মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি। আমাকে দেখে জেনারেল বিস্মিত হলেন। তিনি জানতে চাইলেন আমি সেই রজার্স কি না যার সাথে তিনি ফ্রি-টাউনে টেলিফোনে কথা বলতেন! তিনি আমার বয়সও জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, পরবর্তী আগস্ট মাসে আমার সতের বছর পূর্ণ হবে। জেনারেল আবারও বিস্ময় প্রকাশ করে প্রেসিডেন্টকে বললেন, তিনি ভেবেছিলেন আমি একজন বড়সড় মানুষই হব, কারণ আমার কথাবার্তা ছিল দায়িত্বপূর্ণ। একথা শুনে তারা সকলেই হাসতে লাগলেন। এসবের পর জেনারেল মালু ভাবলেন আমার জন্য উত্তম হবে মনরোভিয়ায় তাদের হেডকোয়ার্টারে যোগ দেয়া এবং ফ্রি-টাউনে সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে কাজ করা। এই মিটিংয়ের পর কোনাক্রি সফররত ফ্রি-টাউনে নিযুক্ত বিবিসির সংবাদদাতা লানসানাহ ফোফানা কোনাক্রিতে আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আমার হোটেলে এলেন। আমি জানি সৈনিক হিসেবে একজন সাংবাদিকের কাছে আমার কোনো পরিকল্পনা প্রকাশ করার কথা নয়। তবে আমি আমার সঙ্কল্প ঘোষণা করলাম যে, নাইজেরিয়ানদের নেতৃত্বাধীন শান্তি রক্ষা বাহিনীকে আমরা চাইল্ড সোলজাররা পূর্ণ সহযোগিতা করব এবং এএফআরসি জান্তাকে উৎখাত করার জন্য আমাদের ডেথ স্কোয়াড সক্রিয় থাকবে। যখন সাংবাদিক এই অপারেশন করার জন্য আমাকে কে সহযোগিতা করছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন আমি তাকে বললাম, তিনি নিজেও জানেন সিয়েরা লিয়নের ৭০ শতাংশ লোকই এই সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে না এবং যারা তাদের সমর্থন করে না তারা অবশ্যই আমাকে সহযোগিতা করবে। সাংবাদিক আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন, এ ধরনের অপারেশন করার ব্যাপারে আমার কী যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা আছে? আমি জবাব দিলাম, আমি ব্যাখ্যা করলেও বিষয়টা

BanglaBook.org

তার বুঝতে কষ্ট হবে। আমি যাদের সাথে লড়াই করব তারা আমার লড়াই করার কথা শুনেই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে! কারণ তারা ভালোভাবেই জানে আমি কে বলছি এবং আমি কোন বিষয়ে কথা বলছি। বিবিসির আফ্রিকা নেটওয়ার্কে এই সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয় এবং এতে ফ্রি-টাউনের জান্তার উপর বিপুল প্রভাব পড়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভিনদেশের কারাগারে

এই অবস্থার পর আমার এবং আমার ছেলেদের লাইবেরিয়ায় গিয়ে ইকোমগ বাহিনীতে যোগ দেয়ার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২৭শে আগস্ট আমি ও চারজন চাইল্ড সোলজার একখানি ওয়েস্ট কোস্ট কমার্শিয়াল এয়ার ক্রাফটে করে কোনাক্রি বিমানবন্দর থেকে মনরোভিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করি। আমরা মনরোভিয়ার জেমস স্পিগ্‌স পেইন বিমানবন্দরে অবতরণ করি। আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই কোনাক্রি থেকে রওনা হয়ে যাওয়ার ফলে মনরোভিয়া বিমানবন্দরে আমাদেরকে তুলে নেয়ার জন্য নির্ধারিত ইকোমগ সিকিউরিটির লোকজন তখনও এসে পৌঁছল না। তাই লাইবেরিয়ার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরেই আমাদেরকে বন্দি করল। আমাকে বন্দি করার যে কারণ দেখানো হয় তা হল এই যে, দু'দিন আগে বিবিসিতে প্রচারিত আমার সাক্ষাৎকার তারা শুনেছে এবং আমাদের গিনিস্থ দূতাবাসের দেয়া ইমারজেন্সি ট্রাভেল সার্টিফিকেট দেখেই তারা বুঝতে পেরেছে যে আমিই সেই আইভান রজার্স। চার্লস টেইলরের লাইবেরীয় সরকার ও এএফআরসি/আরইউএফের মধ্যে বিদ্যমান মৈত্রীর কারণে আমাদেরকে লাইবেরীয় কর্তৃপক্ষ শত্রু হিসেবে গণ্য করে। শহরের একটি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে একটি সেলে আমাদের বন্দি করে রাখা হয়। দু'দিন পর তারা আমাদের পুলিশ সদর দফতরে নিয়ে গিয়ে লাইবেরীয় ভূখণ্ডে বেআইনি প্রবেশের অভিযোগ আনে। ফলে আমাদের আগমনকে তারা 'বিদেশি ভাড়াটিয়া সৈনিকদের অনুপ্রবেশ' বলে আখ্যায়িত করে। পরে আমাদেরকে মনরোভিয়ায় তাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ফলে আমি নিজেকে আবারও জেলখানায় বন্দি অবস্থায় খুঁজে পেলাম, তবে অন্য দেশের মাটিতে। আমার মনে কিছুটা সাহস ছিল এজন্য যে আমার সাথে আমার বন্ধুরা ছিল এবং আমি জানতাম আমাদের গিনিস্থ সরকার ও ইকোমগ আমাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমার বন্ধুর জন্য এটা ছিল এ ধরনের প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই সে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল। তিন দিন পর জেলখানায় খাবার সরবরাহে নিযুক্ত একজন পুলিশ আমাদের সেলে এলেন এবং নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লাইবেরিয়াতে কাউকে আমরা চিনি কি না। আমি বললাম, হ্যাঁ চিনি। তখন তিনি বললেন, মনরোভিয়ায় থাকে এমন কারও ঠিকানা যদি তাকে দিই তাহলে তিনি আমাদের খাতিরে তার সাথে

BanglaBook.org

যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু পুলিশ ভদ্রলোকের উপর আমার কোনো ভরসা ছিল না বলেই আমি তাকে ইকোমগের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিলাম না। আমি একজন ব্রিটিশ ভদ্রমহিলার নাম ও ঠিকানা তাকে দিলাম এই আশায় যে, তিনি হয়তো তাকে খুঁজে পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে ওই ভদ্রমহিলা তখন লাইবেরিয়ার বাইরে ছিলেন। পুলিশ ভদ্রলোক এসে আমাকে জানালেন যে তিনি ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পাননি। এই দুর্ভাগ্যের কারণে ইকোমগের সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় রইল না। এর মধ্যে তার উপর আমাদের কিছুটা আস্থা জন্মেছিল। কারণ তিনি আমাদের প্রথম কাজটা বিশ্বস্ততার সাথেই করেছিলেন। আমরা তার হাতে কিছু টাকা দিলাম যেন তিনি ইকোমগের সাথে যোগাযোগ করেন। পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আমি জেনারেলের কাছে একটি চিঠি লিখে পুলিশটির হাতে দিলাম।

এই ভদ্রলোক আমার দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাগ্রস্ত জেনারেল আমাদেরকে জেলের বাইরে আনার জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। জেলখানায় অবস্থানের আট দিনের মাথায় লাইবেরীয় ডিরেক্টর অব প্রিজন এবং কয়েকজন পুলিশকে সাথে নিয়ে ফোর্স কমান্ডারের মিলিটারি অ্যাসিসট্যান্ট আমাদের নিয়ে যেতে এলেন। এরপর আমাদের হোটেল আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই আমরা রাত্রি যাপন করলাম। এর মধ্যেই আমি সামরিক কর্মকাণ্ড ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ভাবতে খারাপ লাগছিল যে আবার ইকোমগের সাথে আমাকে আর্মি অপারেশনে জড়াতে হবে। পরদিন আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে সেভ দ্য চিলড্রেনের অফিস খুঁজতে গেলাম। ভেবেছিলাম এরাই পারবে আমাকে সামরিক জীবনের অক্টোপাস থেকে রক্ষা করতে। কয়েক ঘণ্টা পর আমরা অফিস খুঁজে বের করলাম কিন্তু ইউনা তখন সেখানে ছিলেন না। নিরাপত্তার কারণে আমরা স্থানীয় স্টাফের কাছে আমাদের কাহিনী প্রকাশ করতে পারিনি। ভয় ছিল যদি সে লাইবেরীয় সরকারের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কেউ হয়! তখন আবার হিতে বিপরীত হবে। বলতে গেলে ব্যর্থ হয়েই আমরা আবার ইকোমগের নিকট ফিরে আসার এবং যা যা আমাদের তারা করতে বলে তা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। অথচ বিভিন্ন প্রতিকূল ও তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং জেলখানায় এত দুঃখ-কষ্টের পর কোনো প্রকার মিলিটারি অপারেশনের ব্যাপারেই আমি মোর আগ্রহী ছিলাম না। যেহেতু সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের আলাদা করে নেয়ার কোনো উপায় আমাদের ছিল না এবং এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে সামরিক পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো যথার্থ পরিচয়ও আমাদের ছিল না তাই আমাদের ইকোমগের সাথেই সহযোগিতা করতে হল। দু'দিন পর ইকোমগ হাই কমান্ডের সাথে আমাদের একটি মিটিং

BanglaBook.org

হল। এতে আলোচনা হয় কীভাবে এএফআরসিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের সূত্রপাত করা যায়, চাইল্ড সোলজার হিসেবে কী ভূমিকা আমরা পালন করব যারা ওই দেশের বিশেষ করে ফ্রি-টাউনের ভূমি সম্পর্কে, ওই দেশের সামরিক শক্তি সম্পর্কে এবং তাদের গোয়েন্দা কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল।

ইকোমগের তৎকালীন চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহামেদ ওয়ান বলেছিলেন, আমার বিস্তারিত সামরিক অভিজ্ঞতা ও শত্রুবাহিনীকে সাবোটাজ করা সম্পর্কে আমার প্রশিক্ষণের কারণে আমাদের যৌথ ভূমিকার কার্যকারিতা হবে প্রশ্নাতীত। এছাড়াও জেনারেল ওয়ান বলেছিলেন তিনি আমাদের উপর এবং নাইজেরীয় বাহিনীর সামরিক শক্তির উপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। মিটিং শেষ করার পূর্বে জেনারেল সুপারিশ করলেন, অপারেশনের প্রয়োজনে লাইবেরিয়ার ভিতরে-বাইরে যাতায়াতের সুবিধার্থে সিয়েরা লিয়ন কন্টিনজেন্টের সদস্য হিসেবে আমাদের সামরিক পরিচয়পত্র দেয়া হবে। মিটিংয়ের শেষে এ ব্যাপারে কাজ করা হল এবং পরদিনই আমাদের পরিচয়পত্র দেয়া হল। এতে আমার র‍্যাঙ্ক দেখানো হল সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে। এছাড়াও নিরাপত্তার কারণে আমাদের হোটেল আফ্রিকা থেকে সরিয়ে রিক্স ইনস্টিটিউটস্থ ইকোমগ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ইকোমগের অপারেশনের জন্য সিয়েরা লিয়নের ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার চিফ হিঙ্গা নরমান এবং কামাজোর হিসেবে পরিচিত সিয়েরা লিয়নের কিছু বেসামরিক মিলিশিয়াকে রাখা হয়েছিল। ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার আমার মিলিটারি অপারেশনের সাফল্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জানতেন। রিক্স ইনস্টিটিউটে থাকাকালে তিনি ও কামাজোর মিলিশিয়ারা আমাকে এবং আমার চাইল্ড সোলজারদের যথেষ্ট সমীহ করত। আমাদের তারা কাব্বাহ সরকারের অত্যন্ত বাধ্য সৈনিক হিসেবে গণ্য করত।

কয়েকদিন পর কোনাক্রিতে অবস্থানরত সিয়েরা লিয়নের প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে টেলিফোন করা হল। বলা হল যে, আমাকে শীঘ্রই গিনি যেতে হবে গোয়েন্দা সন্দেহে গ্রেফতার করা ক'জন চাইল্ড সোলজারকে শনাক্ত করার জন্য। কারণ ওরা নাকি আমার অনুগত সৈনিক বলে দাবি করেছে। যদিও কোনাক্রিতে অবস্থানকারী আমার অন্য সহকর্মীরা এই ছেলেগুলোকে চিনত। তবে ওরা বুঝতে পারছিল না কোনাক্রিতে ওদের কী মিশন থাকতে পারে! এ কারণে ওদেরকে ভালোভাবে প্রত্যয়ন করার জন্য আমাকে কোনাক্রিতে যেতে হবে। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় একখানি ইমারজেন্সি ট্রাভেল সার্টিফিকেট নিয়ে আমি একটি বাণিজ্যিক বিমানে চড়ে বসলাম। আমি

BanglaBook.org

কোনাক্রিতে আসার পর লাইবেরিয়া থেকে আগত যাত্রী হিসেবে বিমানবন্দরে আমাকে আগাগোড়া তল্লাশি করা হল। কারণ গিনিয়ান কর্তৃপক্ষ বরাবরই লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিয়নের মধ্যে যাতায়াতকারী যুবকদের সন্দেহের চোখে দেখত। আমার হ্যান্ডব্যাগ পরীক্ষা করার সময় ওরা আমার সামরিক পরিচয়পত্রখানা পেয়ে গেল, যাতে আমাকে ক্যাপ্টেন পদবির দেখিয়ে মনরোভিয়াতে ইকোমগ কর্তৃপক্ষ ইস্যু করেছিল। আমার ট্রাভেল সার্টিফিকেট দেখে ওরা জানতে পারল যে আমি একজন ১৭ বছরের বালক মাত্র। আমার চেহারা দেখে ওরা বলতে লাগল, আমার বয়স আরও কমই হবে! ওরা প্রশ্ন তুলল, আমি কীভাবে আর্মিতে ক্যাপ্টেন হলাম? সবকিছু আইনসঙ্গতভাবে করার কারণে আমি এতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে বিপদের সময় তা আমার জীবন রক্ষায় সাহায্য করেছিল। আমার মধ্যে ভেঙে পড়ার কোনো লক্ষণ ওরা দেখতে পায়নি। আমার মনোবলও ছিল উন্নত। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমি পুলিশকে বলি যে আমি একজন সৈনিক তবে সামরিক কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারও কাছে এর বেশি কিছু ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একথা বলার সাথে সাথেই আত্মবিশ্বাসহীন ও আতঙ্কগ্রস্ত পুলিশ পিস্তল বের করে আমার দিকে তাক করে রাখল এবং তাদের দুজন আমাকে হাতকড়া পরিয়ে দিল। তারা পরে একটি পুলিশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করে এবং তিনখানা গাড়িভর্তি সৈন্য আনিয়ে নেয়। গিনির কোনাক্রি বিমানবন্দরে আমাকে ঘিরে মহা হুলস্থুল লেগে গেল। আমাকে বিমানবন্দরের চিফ সিকিউরিটির সাথে একখানি পিওগিয়ট ৫০৪ গাড়িতে বসিয়ে দেয়া হল। ওরা আমাকে সামরিক সদর দফতরে নিয়ে গেল। দশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে তাদের মিলিটারি ও পুলিশের সকল জুনিয়র অফিসার সেখানে এসে হাজির হল। এরপর তারা আমাকে একটি কনফারেন্স হলে নিয়ে গেল এবং একজন দোভাষী দিয়ে আমাকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে বলল। আগেই বলেছি গিনির লোকেরা ইংরেজি বোঝে না।

আমি প্রথমে তাদেরকে বললাম যে, আমি খুব ক্ষুধার্ত তাই আমি খেতে চাই। ওরা আমাকে খাবার আনিয়ে দিল এবং আমি খাওয়ার আগে তা তারা খেয়ে পরীক্ষা করল। খাওয়া শেষ করার পর আমি আবার দাবি করলাম যে, আমি তাদেরকে কিছু বলতে পারি, যদি সিয়েরা লিয়নের রাষ্ট্রদূতকে পাশে রাখা হয়। সবুজ ইউনিফরম পরা একজন, যার কথা শুনে কর্তাব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল, দোভাষীকে বললেন, তারা রাষ্ট্রদূতকে কেবল তখনই আনবেন যখন তারা মনে করবেন আমার কোনো বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তার এখানে থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি বললেন, আমার বিশেষভাবে জানা উচিত, আমার বর্তমান মর্যাদা হচ্ছে গিনির ভূখণ্ডে গ্রেফতারকৃত একজন ভাড়াটিয়া সৈনিকের।

BanglaBook.org

আমার নিজের স্বার্থে ব্যাখ্যা বা প্রমাণের সাহায্যে আমি যদি এর পরিবর্তন ঘটাতে চাই তাহলে আমার তা করা উচিত, যাতে তারা বিষয়টি অনুসন্ধান ও আমার পদমর্যাদা নির্ধারণ করার সুযোগ পায়। এরপর আমি তাদেরকে বললাম আমাকে কিছু সময় দিতে, কারণ আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। একথা শোনার পর তারা কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিককে ডেকে আনল। আমি হাতকড়া পরা অবস্থায় একখানি ইজি চেয়ারে নিতান্ত অনিচ্ছাভরে বসে ছিলাম এবং তারা আমার অনেকগুলি ছবি নিল ও ভিডিও করল। এরপর তারা আমাকে তাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে গেল। সেখানে আমি কয়েকজন সৈনিকের সাক্ষাৎ পেলাম যাদেরকে সিয়েরা লিয়ন আর্মি থেকে পালিয়ে আসায় গিনি কর্তৃপক্ষ বন্দি করেছে। এদের কারও কারও ঘটনা ছিল আরও বেশি করুণ ও মর্মান্তিক। যদিও আমার জন্য এটি ছিল একই বছরে তিনটি ভিন্ন দেশে তৃতীয়বারের মত কারাবরণ! তিন দিন পর আমি কিছু লোককে আমার সেলের সামনে এসে আমার নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করছে দেখতে পেলাম। এরাই আমাকে কারাগারে নিয়ে এসেছিল। আমি জবাব দিলে তারা আমাকে সেলের বাইরে আসতে বলল। তারা আমাকে আবার সামরিক সদর দফতরে নিয়ে গেলে আমি সেখানে সিয়েরা লিয়নের রাষ্ট্রদূত এবং প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর নিরাপত্তায় নিযুক্ত সেই গিনিয়ান ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎ পেলাম। তারা আমার কাছে এসে আমাকে সবকিছু ঠিক আছে কি না জিজ্ঞেস করল। যদিও ব্যাপারটা তা ছিল না তবু আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। তারা আমাকে জানাল যে, গত তিন দিন ধরে তারা রেডিওতে শুনে এসেছে যে গিনির বিমানবন্দরে একজন মার্সেনারি বা ভাড়াটিয়া সৈন্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যে নিজেকে ইকোমগের সদস্য বলে দাবি করছে। যেহেতু আমার নাম ফরাসি ভাষায় ভিন্ন উচ্চারণে বলা হয়েছে তাই তারা কখনই ভাবেনি যে ওটা আমি হতে পারি। রাষ্ট্রদূত বললেন, কেবল গতরাতেই তিনি আমাকে টিভিতে দেখেছেন। এরপর গিনির কর্তৃপক্ষ এত বেশি বিধিবিধান মানতে গেল যে ওই দিন আর আমার পক্ষে জেলখানা ত্যাগ করা সম্ভব হল না আমাকে আরও দু'দিন জেলে থাকতে হল। এসময় আমি ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো কিছু করার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমার আপন কিছু লোকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। আমার জন্যই আমার প্রায় দেড়শ' সহকর্মী এই সমস্যায় জড়িয়ে গেছে, এ কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই বিষয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আটক ছেলেগুলোকে চিহ্নিত করার কাজ শেষ করার পর লাইবেরিয়াতে গিয়ে আমাদের ইকোমগে যোগ দেয়ার ব্যাপারে সরকার কিছু জরুরি নীতিমালা প্রণয়ন করল।

BanglaBook.org

এক সপ্তাহ পর একটি নাইজেরিয়ান বিমান আমাদেরকে কোনাক্রি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লাইবেরিয়াতে নিয়ে গেল। ইকোমগের তৎকালীন জিএসও-১ লে. কর্নেল নিকোলাস কর্নেলিয়াস আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। কয়েক মিনিট পর অন্য একটি নাইজেরিয়ান সামরিক বিমান নাইজেরিয়ার র‍্যাপিড ডেপ্লয়মেন্ট ফোর্সের ১৫০ জন সৈনিককে নিয়ে এল। ক'দিন পর ইকোমগ হাই কমান্ড সিয়েরা লিয়নে ইকোমগের সৈন্য সংখ্যা আরও এক হাজার বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে এক হাজার সৈন্যকে লুঙ্গি এয়ারপোর্টে ইকোমগ অবস্থানে বিমানের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হল। এরা সকলেই ছিল নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর সদস্য। ওই দিন বিকেলে একটি বিশেষ বিমানে করে আমি এবং আমার ছেলেরা লুঙ্গিতে এলাম। ওই অপারেশনের সামরিক গোয়েন্দাপ্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত এক নাইজেরিয়ান মেজর এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ম্যাক্সওয়েল খোবে বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত জানালেন। এর মধ্যে কর্নেল খোবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

চাইল্ড সোলজাররা বেয়নেটের খোঁচায় বিক্ষত করেছিল এই বালকের বুক

আমার আসার সাথে সাথেই জেনারেল ভাবলেন, এফএম-৯১.১ ব্র্যান্ডে প্রোপাগান্ডা রেডিওতে আমার কথা বলা উচিত। এটা তখন লুঙ্গিতেই ছিল। বর্তমান

কাব্বাহ সরকারের ইনফরমেশন মিনিস্টার ড. জুলিয়াস স্পেনসার তখন বেতারের একজন ঘোষক ছিলেন। সাক্ষাৎকারের পর আমি সকল চাইল্ড সোলজার এবং ডেথ স্কোয়াডের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি ইকোমগের নিকট আত্মসমর্পণের আবেদন জানালাম। এতে ফ্রি-টাউনে এএফআরসি জান্তার উপর প্রবল প্রভাব পড়ল। এই বেতার সম্প্রচারের পর আমি জেনারেলকে বললাম, যুদ্ধবন্দি হিসেবে রাখা আমার বন্ধুদের আমি দেখতে চাই, কারণ ওটাই ছিল আমার ইকোমগে যোগদানের মূল লক্ষ্য। তখন আমি, জেনারেল এবং মেজর দন নামের একজন গোয়েন্দা অফিসার একটি জিপে চড়ে গ্যারিসন মিলিটারি ব্যারাকের উদ্দেশে রওনা হলাম, যেখানে আমার সকল সহকর্মী ও আত্মসমর্পণকারী সৈনিকদের রাখা হয়েছিল। আমরা ব্যারাকের নিকটবর্তী হলে জেনারেল আমাকে জিপে অপেক্ষা করতে বললেন। তিনি সকল সৈনিককে প্যারেডে হাজির করলেন এবং তাদের বললেন, আজ তাদের জন্য এক বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছে। এই বলে তিনি তাদেরকে চোখ বন্ধ করতে বললেন। তিনি বলে দিলেন কেউ যেন গোয়েন্দাগিরি না করে। তিনি এই বলে ধমকে দিলেন যে, কেউ গোয়েন্দাগিরি করলে তিনি তা দেখতে পাবেন কারণ তিনি চারদিকে ঘোরাঘুরি করবেন। তারা সবাই চোখ বন্ধ করল এবং তাদের বলা হল, তারা যেন 'আরামে দাঁড়াও' আদেশ পেলেই কেবল চোখ খোলে। তিনি তখন আমাকে ইশারায় ডাকলেন। আমি গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম এবং তখন তিনি আদেশ দিলেন 'স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ'! চোখ খোলার পর ওরা আমাকে দেখতে পেল এবং মুহূর্তেই সমস্ত প্যারেড ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল! কারণ ওরা আমাদের দিকে ছুটে এল এবং আমাকে মাথায় তুলে নিল। ওরা মহানন্দে গান গাইতে ও নাচতে লাগল। সামরিক শৃঙ্খলা বা জেনারেলের ভয় কিছুই তাদের বিরত রাখতে পারল না। দেড় ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে নাচ গান চলল।

পরে আবার প্যারেডকে দাঁড় করানো হল এবং আমি তাদের সামনে বক্তব্য রাখলাম। তাদের কথা কতটা আমার স্মরণে ছিল এবং তাদের মুক্ত করার জন্য আমি যে মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও প্রস্তুত সে কথা আমি তাদেরকে বললাম। সহজ সরল চাইল্ড সোলজাররা আমার একেকটি শব্দের পরই চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করছিল। এরপর জেনারেল আমার সাহসের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখলেন। আমি আমার বন্ধুদের কত বেশি ভালোবাসি এবং অত্যন্ত সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আমি যে আমার বন্ধুদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছি তা-ও তিনি উল্লেখ করলেন। এরপর জেনারেল সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন, তিনি সেনাবাহিনীতে আছেন ১৯৬৯ সাল থেকে, অর্থাৎ আমার জন্মেরও দশ বছর আগে থেকেই, কিন্তু তিনি সৈন্য বাহিনীতে এ পর্যন্ত এমন কাউকে খুঁজে পাননি যে সহকর্মীদের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং তিনি মনে করেন, যেহেতু

BanglaBook.org

আমার মত আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তাই সৈন্যদের উচিত হবে আমার প্রতি তাদের আনুগত্য তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়া।

এরপর জেনারেল আমাকে তার সাথে বিমানবন্দরে তার আবাসস্থলে যেতে বললেন যাতে আমার জন্য যথাযথ বাসস্থান তৈরি হওয়ার পর আমি বন্ধুদের সাথে এসে যোগ দিতে পারি। কিন্তু পাঁচ মাসেরও অধিক সময় ধরে আমার বন্ধুদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমার পক্ষে তাদের তক্ষুনি ছেড়ে যাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। আমাকে তাদের ব্যারাকেই রাত কাটাতে হল। সারা রাত আমরা কেউ ঘুমানোর সুযোগ পেলাম না। ছেলেদের প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কাহিনী আগ্রহভরে আমাকে শোনাল। ওদের এবং আমার কারওই গল্পের যেন শেষ নেই। ওদের সাথে সেই রাত কাটানোর অনুভূতির কথা আমি কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারব না।

কয়েকদিন পর জেনারেল জানালেন যে ফ্রি-টাউনে সামরিক অভিযানের জন্য আমাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে। এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছিল 'অপারেশন স্যান্ড-স্টর্ম'। আমাদের প্রশিক্ষণের বিশেষ দিক ছিল 'ফাইটিং ইন বিল্ড-আপ এরিয়া' অর্থাৎ অট্টালিকা-সমৃদ্ধ স্থানে যুদ্ধ করার পদ্ধতি। স্বচ্ছন্দভাবে এই প্রশিক্ষণ এগিয়ে গেল এবং এর মাধ্যমে আবারও আমার প্রতি ফোর্স কমান্ডারসহ কর্তৃপক্ষের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হল। এটা বিশেষত একারণে যে সকলেই জানত ফ্রি-টাউন এলাকা আমার পরিচিত এবং স্পেশাল ফোর্সের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ আমার ছিল, যা এই অভিযানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এক হাজার সৈনিকের মধ্যে ৯২ জন ছিল আমাদের ডেথ স্কোয়াডের সদস্য। এদেরকে আমি পূর্বেই সংগঠিত করেছিলাম। ৫৩ জন ছিল অন্যান্য চাইল্ড সোলজার এবং ৮৪ জন ছিল আত্মসমর্পণকৃত সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য, যাদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটকে রাখা হয়েছিল। বাকি সকলেই ছিল নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর সদস্য। প্রশিক্ষণ চলল সাড়ে চার মাস ধরে অর্থাৎ অক্টোবর '৯৭ থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারি '৯৮ পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ শেষে এএফআরসি এবং আরইউএফের যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রি-টাউনে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আবারও যুদ্ধের ময়দানে

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে আমরা সৈনিকদেরকে অভিযানের জন্য আকাশপথে লুঙ্গি থেকে হেস্টিংস খেলার মাঠে নিয়ে যেতে শুরু করলাম। লুঙ্গি থেকে সড়কপথে ফ্রি-টাউন যেতে হলে একটি দীর্ঘ ফেরি পার হতে হয়। হেস্টিংস হল ফ্রি-টাউনের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে মহাসড়কের পাশে সাগর তীরবর্তী পাহাড়ি এলাকা। এখানে ছোট একটি এয়ারপোর্টও আছে। আমাদের বাহিনী ছিল জনবল ও অস্ত্রের মানের বিচারে উন্নততর। তবু এএফআরসি জান্তা আমাদের জেনারেলের সমঝোতামূলক দাবিদাওয়ার প্রতি অনিহা প্রকাশ করল। বরং প্ররোচনামূলক কথাবার্তা বলে আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা করতে লাগল। এদিকে প্রায় দেড় হাজার সৈনিককে স্থানান্তর করার পর আমরা বিভিন্ন কোম্পানিতে তাদেরকে ভাগ করে দিলাম। প্রতিটি কোম্পানির জনবল হল একশ' এবং কমান্ডার নিযুক্ত করা হল ক্যাপ্টেন বা মেজর পদবির একেকজন অফিসারকে। আমি আলফা কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত হলাম, যা ছিল টার্স্ক ফোর্স কমান্ডারের সাথে। আমার কোম্পানিকে র‍্যাপিড ডেপ্লয়মেন্ট ফোর্সের ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ব্যাজ দিয়ে চিহ্নিত করা হল। এই কোম্পানির দায়িত্বগুলির মধ্যে ছিল ফ্রি-টাউনের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সবচেয়ে বড় সেনা-স্থাপনা 'উইলবারফোর্ড ব্যারাক' দখল করা, এএফআরসি চেয়ারম্যান মেজর জনি পল করোমার বাসভবন দখল করা এবং এই সকল এলাকার বাকি সব সেনা-লক্ষ্যবস্তু দখল করা। তিনজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলের অধীনে মেজর ও ক্যাপ্টেনদের নেতৃত্বাধীন কোম্পানিগুলোকে স্টেট হাউজ ও সমুদ্রবন্দরসহ অন্যান্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করার দায়িত্ব দেয়া হল। আমার সৈন্যদের মধ্যে শতকরা আশিজনই ছিল সেই সব ছেলে যারা পূর্বে ইকোমগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এর আগে অনেকগুলো অপারেশন আমরা একসাথে করেছি বলে আমাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ছিল সবচেয়ে উত্তম। তাছাড়া আমাদের সামরিক যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছিল যুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমেই যা আমাদের মিত্র এবং শত্রুরা ভালোভাবেই জানে।

১৯৯৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এএফআরসি-আরইউএফের মিলিত শক্তি বুঝতে পারে যে, আমাদের হেলিকপ্টার গানশিপগুলো দু'দিন ধরে ঘন ঘন লুঙ্গি

BanglaBook.org

বিমানবন্দর থেকে হেস্টিংসে আসা-যাওয়া করছে। ফলে আমরা তাদের উপর আক্রমণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তারাই আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ করা শুরু করল। আমাদের অপারেশন শুরু করার তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সে পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমরাও ওই দিনই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলাম। জেনারেল আমাদের বলেছিলেন, কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে যৌথ বাহিনীর (এএফআরসি-আরইউএফ) উপর আক্রমণ করার ম্যান্ডেট দিয়ে পাঠাননি, কিন্তু সৈনিক হিসেবে আমাদের প্রতি এই ম্যান্ডেট দেয়া আছে যে যেসব অবস্থান থেকে আমাদের উপর আক্রমণ আসবে তাকেই আমরা আমাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার অংশ হিসেবে গণ্য করতে পারব। তিনি বলেছিলেন, যখনই তুমি একটি ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনবে তখনই তুমি সেটাকে তোমার শত্রু বলে গণ্য করে নেবে এবং ওই এলাকাকে তোমার প্রতিরক্ষা এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে নেবে।

তার এই বক্তব্য আমাদের মনোবল ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা তাই যেখান থেকেই ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনতাম সে এলাকাকেই আমাদের দখলে নিয়ে নিতাম। ওইদিন দুপুরের মধ্যেই আমরা ফ্রি-টাউনের অর্ধেক এলাকাকে আমাদের প্রতিরক্ষা এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। বেলা দু'টার মধ্যে আমার কোম্পানি কুখ্যাত এসএস ক্যাম্প দখল করে নিল, যেখানে এএফআরসি/আরইউএফের ক্র্যাক স্কোয়াডের ঘাঁটি ছিল। এটাকেই তাদের প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে গণ্য করা হত। ক্র্যাক স্কোয়াডের ৫০ জনের বেশি সদস্য যুদ্ধবন্দি হয়ে গেল। আমাদের এই অগ্রগতির পর আমার গঠিত ডেথ স্কোয়াডের যেসব সদস্য আগে ইকোমগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করল। এই অবস্থায় এএফআরসি সরকারের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চেয়ারম্যান লে. কর্নেল এসএজে মুসা এবং চেয়ারম্যান বুঝতে পারলেন যে তাদের এই যুদ্ধ অনিবার্য ব্যর্থতার দিকে এগোচ্ছে। তাই তারা যুদ্ধবিরতি ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বেতারের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে শুরু করল। আমার রেডিও মনিটর করার সময় জেনারেল তাদের এই বলে জবাব দিলেন যে আমরা তাদের সাথে মোটেই যুদ্ধ করছি না বরং নিজেদের অধিকৃত এলাকার প্রতিরক্ষা করছি মাত্র। এছাড়া আমরা কেবল আমাদের সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। এই বার্তার পর জেনারেল আমাদের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পরিবর্তন করে ফেলেন। এর পর তিনি আমাদের সবাইকে নির্দেশ দিলেন, যদি আমরা যৌথ বাহিনীর সৈন্যদের জীবন্ত অবস্থায় বন্দি করতে নাও পারি তবু আমরা যেন তাদের প্রতি গুলি না করি। বরং আমরা যেন তাদেরকে পশ্চাদপসরণে পথ করে দিই। আমরা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম না বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত

BanglaBook.org

প্রেসিডেন্ট কাব্বাহ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আমরা তাই তাদের হত্যা বা বন্দি করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না। আমরা বরং তাদের ক্ষমতা থেকে এবং ক্ষমতার অবস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

ওইদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা পুরোটা পেনিনসুলা রোডই ছেড়ে দিলাম, যা ছিল শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ। তখন তারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে উইথড্র করে চলে গেল। ১৩ তারিখ ভোর ছ'টার আগে সামান্য বাধার সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র এবং দুপুর নাগাদ স্টেট-হাউস দখলের যুদ্ধে একটি রকেটচালিত গ্রেনেডের বিস্ফোরণে টাস্ক ফোর্স কমান্ডার গুরুতরভাবে আহত হন। তাকে চিকিৎসার জন্য অতিদ্রুত লুঙ্গি নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা তখনও শহর দখলের জন্য যুদ্ধ করছিলাম। ওইদিন বিকেল চারটা নাগাদ সমগ্র ফ্রি-টাউন আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। তখন আমি 'অপারেশন সার্চ ফর দ্য এনিমি' সংঘটিত করলাম এই লক্ষ্যে যেন এএফআরসি সরকারের অধীনে যারা কাজ করছিল তাদের সকলকেই বন্দি করা হয়। চৌদ্দ তারিখের মধ্যেই আমরা দু'শতাধিক মিলিটারি অফিসারকে বন্দি করলাম যারা গভীরভাবে এএফআরসি শাসনের সাথে জড়িত ছিলেন। আবারও আমি এক বিরাট ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হলাম; কেননা শহরের হাজার হাজার লোক আমাকে দেখার জন্য এবং অসংখ্য সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ভিড় করছিল।

তিন দিন পর কেউ একজন এসে আমাকে মেজর কুলার লেখা একখানা চিঠি হাতে দিল। ওই সময় সমগ্র শহরের জনগণ তার মত পরাজিত জান্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের পাকড়াও করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এএফআরসি জান্তার সাথে সম্পর্ক ছিল এই সন্দেহে বিভিন্ন নারী-পুরুষের সাথে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের যে ধরনের কঠোর ব্যবহার করতে আমি দেখেছি তার প্রেক্ষিতে তাকে কীভাবে সাহায্য করব তা ভেবে আমি বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলাম। তিনি আমার জীবন রক্ষার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন সে কথা আমার মনে পড়ল। আমাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে আমার ছেলেরা এর কারণ জানতে চাইল। আমি তাদের কিছুই বললাম না কারণ আমি জানতাম ওদের প্রতি এএফআরসির, বিশেষ করে লে. কর্নেল মুসার, দুর্ব্যবহারের কারণে ওদের মেজাজ কতটা বিগড়ে ছিল। আমি জানতাম আমি যদি ওদের কাছে অন্যভাবে ব্যাপারটা বলি যে, তার গোপন আস্তানায় আমার যেতে ভয় করছে কারণ তার সরকারকে উৎখাতের ব্যাপারে আমি ইকোমগের সাথে যে ভূমিকা পালন করেছি তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন, তাহলে বরং ভালোই কাজ হবে। আমি তাই আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ক'জন ছেলেকে তার বিষয়ে বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাছাড়া

BanglaBook.org

তিনি আগে আমার জন্য যা যা করেছেন তা আমি তাদের কাছে তুলে ধরলাম। আমার কথা শুনে তারা তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে শুরু করল এবং আমরা সবাই মিলে তার গোপন আস্তানায় গেলাম। আমরা ছাগল রাখার জন্য তৈরি রান্নাঘরের মত ছোট একটি ঘরে মেজর কুলার সাথে দেখা করলাম। এমন জায়গা যে কেউ ভাবতেও পারবে না এখানে কোনো মানুষ বাস করে! তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং তাকে দয়া করে সাহায্য করতে বললেন। তার দিকে তাকিয়ে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। আমি আট বছর আগে লাইবেরিয়াতে এনপিআরসি বিদ্রোহীদের গুলি খাওয়া আমার আব্বা ও আম্মার মৃত্যুকালীন অনুরোধ যেন শুনতে পেলাম! আমারও কান্না এসে গেল। আমি তখন ছেলেদের বললাম, এই মহিলাকে সাহায্য করার দাবি আমার উপর আছে এবং এতে যে কোনো মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত। আমি তাকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলে রেডক্রস অফিসে গেলাম এবং সেখানে একজন অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। আমি তাকে আমার পরিচয় দিলাম এবং মেজর কুলা সম্পর্কে সব কথা বললাম। আমি তাকে অনুরোধ জানালাম তারা যেন মেজর কুলাকে তাদের কাছে লুকিয়ে রেখে আমাকে সাহায্য করেন, যতদিন না আমি তাকে দেশের বাইরে পাঠানোর সুযোগ পাই। মানবতার খাতিরে ওই ভদ্রলোক আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আমি আবার তার গোপন আস্তানায় এসে তাকে নিয়ে রেডক্রস অফিসে গেলাম এবং সেখানে তার সাথে আমার কয়েকজন ছেলেকে রেখে এলাম। তিনি সেখানে এক সপ্তাহ ছিলেন আর প্রতিদিন আমি তার জন্য খাবার নিয়ে যেতাম। আমি তাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছিলাম।

ক'দিন পর এক রবিবার রাতে জেনারেল, কিছু সিনিয়র অফিসার এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে আমি ডিনার করছিলাম। আমি তখন তাদের সবাইকে একটি প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্ন ছিল, পুরো অপারেশনের শেষ দিকে যে সকল লোককে, বিশেষত সেনাসদস্যদেরকে বন্দি করা হয়েছে এবং পাদেমবা রোড কারাগারে রাখা হয়েছে তাদের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে? তাদেরকে কি হত্যা করা হবে না বাকি জীবন জেলখানায় বন্দি করে রাখা হবে? ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর জো ডেমবি বললেন, সম্ভবত তাদেরকে হত্যা করা হবে না এবং বাকি জীবনের জন্য জেলেও পোরা হবে না। কারণ পৃথিবীতে কোনো সরকারই এ পর্যন্ত তিন শতাধিক লোককে হত্যা করেনি। তখন জেনারেলও ভাইস প্রেসিডেন্টের মত একই কথা বললেন। তিনি আরও বললেন, তাদেরকে তাদের নিরাপত্তার জন্যই জেলে রাখা হয়েছে। কারণ এখন যদি ওদেরকে সাধারণ লোকের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা

BanglaBook.org

ওদেরকে হত্যা করবে। যা-ই হোক না কেন দেশের উন্নয়নে এই সকল লোকেরও ভূমিকা রয়েছে।

আমার মনে হল আমি আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব পেলাম। ডিনারের পর আমি রেডক্রস অফিসে গেলাম এবং মেজর কুলাকে কথাগুলো জানালাম। আমি তাকে ইকোমগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বললাম, কারণ তার মত ব্যক্তিদের প্রচণ্ডভাবে খোঁজা হচ্ছিল এবং তাদের বাঁচানোর জন্য আমার মত হাতেগোনা লোকই নিজের জীবন বাজি রেখে এগিয়ে আসবে। অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোকও বললেন যে তিনি বিশ্বাস করেন শেষ পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। মেজর কুলা ওই ভদ্রলোক এবং আমার কথায় রাজি হলেন। পরদিন সকালে আমরা তাকে নিয়ে উইলবারফোর্স ব্যারাকে ইকোমগের ঘাঁটিতে গেলাম। আমরা তাকে ইকোমগের নিকট আত্মসমর্পণ করালাম। তাকে যে কোনো রকম নির্যাতন ও অপমান থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজ আমি সফলভাবে করতে সমর্থ হলাম। তিনি আমার জীবন বাঁচাতে আমাকে কী পরিমাণ সাহায্য করেছেন তা আমি জেনারেলকে জানালাম, যিনি ছিলেন টাস্ক ফোর্স কমান্ডার এবং আমার ব্যক্তিগত বন্ধুর মত। তার ক্ষমতা এবং প্রভাবের অধীনে সর্বোতভাবেই তিনি যেন মেজর কুলার জীবন রক্ষায় সাহায্য করেন এই অনুরোধ আমি তাকে করলাম। জেনারেল আমাকে কথা দিলেন এবং মেজর কুলাকে তার অন্য সহকর্মীদের সাথে পাদেমবা রোড কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল।

এরপর জেনারেল আমাকে বললেন, একদল সৈন্য নিয়ে আমি বিদ্রোহীদের কবল থেকে হীরক-সমৃদ্ধ শহর কোনো দখল করতে যাওয়া কথা, কারণ ওই এলাকাটি ছিল আমার পরিচিত। এই মহিলার জীবন রক্ষায় সাহায্য করার জন্য আমি তখন সব কাজ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি আমার ছেলেদেরকে জানালাম, আমাদেরকে অন্য এক মিশনে কোনো যেতে হবে। ক'দিন পর আমাদের নাইজেরীয় সেনাবাহিনীর র‍্যাপিড ডেপ্লয়মেন্ট ফোর্স ১৯৭ ব্যাটালিয়ন ও ৫ ব্যাটালিয়নের সাথে বেসামরিক মিলিশিয়া কামাজোরদের কোনো দখলের জন্য সংযুক্ত করা হল। আমরা অনেকগুলো আর্মার্ড পারসোনাল ক্যারিয়ার, অ্যামফিবিয়ান ট্যাঙ্ক, এন্টি এয়ারক্রাফট ওয়েপন ও সাপোর্ট ওয়েপন নিয়ে কনভয় আকারে ফ্রি-টাউন ত্যাগ করলাম। আমরা ওইদিনই প্রথমে উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী মাকেনি দখল করলাম, যা ছিল সামরিক জান্তা ও বিদ্রোহীদের মিলিত শক্তির দ্বিতীয় শক্ত ঘাঁটি। পরে আমরা মাছিংও দখল করলাম এবং তিন দিন পর কৈদু শহর অভিমুখে যাত্রা করলাম। সেখানে বিদ্রোহীদের পরাজিত করে শহরের দখল নিতে আমাদের দু'দিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কৈদু ছিল ডিস্ট্রিক্ট সদর দফতর। এখানে আমরা আমাদের সৈন্যদের মোতায়েন করলাম। যদিও

BanglaBook.org

আমরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাহিনী ছিলাম তথাপি বিদ্রোহীরা প্রতিদিনই আমাদের উপর আক্রমণ করত। কৈদু দখল করার এক সপ্তাহ পর জেনারেল ও অন্য অফিসাররা ওই এলাকার অবস্থা পরিদর্শন করতে এলেন।

এই পরিদর্শনের সময় কথাবার্তার একপর্যায়ে আমি জেনারেলকে জানালাম, গিনিতে অবস্থানকালে প্রেসিডেন্ট ওয়াদা করেছিলেন যে আমার স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সবকিছুই তিনি করবেন। আমি তাকে বললাম, প্রেসিডেন্ট এখন ফ্রি-টাউনে ফিরে এসেছেন; তাই আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে চাই। জেনারেল আমার অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং আমার আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করলেন। তিনি আমাকে সেদিনই তার সাথে ফ্রি-টাউনে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু ব্যাপারটা এমন ছিল যে আমার উদ্যোগ আর প্ররোচনাতেই অনেক চাইল্ড সোলজার সেই অপারেশনে যোগ দেয়। ওদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন তখন কোনোতে কাজ করছিল। তাই আমি জেনারেলকে জানালাম, ওই মুহূর্তে তাদেরকে ছেড়ে একা চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আমাদের সকল চাইল্ড সোলজারের ফ্রি-টাউনে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং পর্যায়ক্রমে ওদের সকলকেই সাহায্য করার ব্যবস্থা নেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কামাজোরদের নৃশংসতা

বিভিন্ন যুদ্ধে আমাদের প্রদর্শিত সাহসিকতার জন্য কোনোতে থাকাকালে নাইজেরীয় সৈনিক এবং বেসামরিক মিলিশিয়ারা আমাকে ও আমার ছেলেদেরকে যথেষ্ট সম্মান দেখাত। পরে তাদের প্রায় সকলেই হীরক-ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। হীরক-ব্যবসার সাথে আমাদের কোনো সংস্রব ছিল না। একদিন বিদ্রোহীরা আমাদের আক্রমণ করল এবং আমরা তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলাম। এসময় এমন কিছু ঘটনা দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয় যা জীবনে আর কখনও দেখিনি। ঘটনার বীভৎসতায় আমি খুব বিহ্বল হয়ে পড়ি এবং ওইসব লোকের সাথে সংস্রব রাখার জন্য খুবই আফসোস হয় আমার। সিডিএফ সদস্য কামাজোররাই এই নৃশংসতা ঘটায়। কামাজোরদের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল সিয়েরা লিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মেন্ডে গোত্রের লোক। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও এরা নিজ নিজ সোসাইটির দেবতায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করত। আধুনিক শিক্ষা পায়নি বলে এদের চলা-বলা, কথা-বার্তা ও ব্যবহারে একধরনের বর্বরতা প্রকাশ পেত। ১৯৯৩ সালে ক্যাপ্টেন এসট্রেসারের এনপিআরসি সরকারের সময় দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে আরইউএফ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আর্মিকে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম সংগঠিত করা হয়েছিল। কারণ তারা ছিল ওই এলাকার সাথে পরিচিত। পরবর্তীতে কাব্বাহ সরকারের সমর্থনে কামাজোররা এএফআরসি/আরইউএফ জান্তার বিরুদ্ধে প্রদেশগুলোতে যুদ্ধ করার জন্য ইকোমগের সাথে যোগ দেয়। এভাবেই আমাদের সাথে তাদেরকে কোনোতে একই প্লাটফর্মে ও একই দলে হাজির হতে হয়। যুদ্ধে ওখানকার অনেক বিদ্রোহীকে বন্দি করা হয়। একদিন কামাজোররা বিদ্রোহীদের একজনকে জীবন্ত ধরে এনে শুইয়ে দেয়। কয়েকজন মিলে তার হাত-পা জোর করে ধরে রাখে এবং একজন কামাজোর ধারালো ছুরি দিয়ে জীবন্ত লোকটার বুক চিরে কলিজা বের করে আনে। মানবতা সম্পর্কে ন্যূনতম চেতনাহীন লোকগুলো যখন তাজা কলিজাটা নিজেদের হাতে নিয়ে টুকরো টুকরো করছিল তখনও তা নড়ছিল! আমাদের অবাক করে দিয়ে এই কাঁচা কলিজার টুকরোগুলি ওরাই খেয়ে ফেলল। আমরা কয়েকজন এ ঘটনা দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত হই। কিন্তু ওখানে উপস্থিত লে. কর্নেল পদবির একজন নাজেরিয়ান কমান্ডার আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি উপদেশ দিলেন যে এ ধরনের

BanglaBook.org

লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত হবে না, যারা নিতান্তই অমানবিক স্তরের ও বাজে প্রকৃতির। যারা জীবনের মূল্য বোঝে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো মানে হয় না। তিনি বললেন, এদের মধ্যে অনেকেই তো বাড়িতে নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে এসেছে যারা তাদের ফিরে পাওয়ার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। মানবিকতার এসব দিক কি এরা বোঝে! তার শেষ কথা হল, নিজস্ব বাহিনীর মধ্যে এক দল অন্য দলের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া অর্থহীন এবং আমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত যে সৈনিক হিসেবে আমাদের শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আমরা যুদ্ধ করছি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য, ধ্বংস করার জন্য নয়। কর্নেল আরও বললেন, আমাদের এলাকা থেকে কামাজোরদের উঠিয়ে নেয়ার জন্য তিনি সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কর্নেল সাহেব যখন ফ্রি-টাউনে কামাজোরদের উর্ধ্বতন কর্তাদের সাথে যোগাযোগ করছিলেন ওই সময়ের মধ্যে কামাজোররা লোকটাকে রান্না করে খেয়ে ফেলল! এসব দেখে আমরা তাদের সম্পর্কে একপ্রকার ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ হতাশ, বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। অবশেষে জেনারেল হেলিকপ্টার পাঠিয়ে আমাকে ও আমার ছেলেদেরকে ফ্রি-টাউনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

ফ্রি-টাউনে আমি জেনারেল খোবে এবং অন্যদের কাছে এই কাহিনী বর্ণনা করলাম। এটা ছিল তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমি জেনারেলকে বললাম, একারণেই আমি সম্পূর্ণরূপে আর্মি ছেড়ে দিতে চাই এবং আমার উচিত হবে জীবনের জন্য সিয়েরা লিয়ন ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়া। সেই স্মৃতি আমার কাছে এত বীভৎস ঠেকে যে এখনও তা মনে হলে আমি ভীষণ অস্থির বোধ করি। পরে আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে তার দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট লজে গেলাম। তিনি আমাকে ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিলেন, কারণ তিনি সবেমাত্র দেশে ফিরেছেন এবং অনেক কিছুই তখনও ঠিক হয়নি। তবে তিনি একথাও বললেন যে, তিনি এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন। এরপর আমি সেই সকল লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম যারা পূর্বে আমার পড়া-লেখার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টসহ সরকারের এই সকল লোকের প্রত্যেকেই আমাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। তারা বলেছিলেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। সহকর্মীদের কাছে আমার আর মুখ রক্ষা হল না। কারণ এসব লোকের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই আমি আমার বন্ধুদের অনেক রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

এবার ফ্রি-টাউনে এসে যাদের কাছে গেলাম তাদের সব কথাই ছিল আমাকে পূর্বে যা বলেছিল তার বিপরীত। যা হোক, আমার অধিকাংশ বন্ধুই তখনও

BanglaBook.org

সামরিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিল কারণ আমি তাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। আমি তাদেরকে নিজেরা যা ভালো মনে করে তা করার জন্য ছেড়ে দিলাম। পরে আমি জেনারেল খোবের সাথে দেখা করলাম। তিনি তখন সিয়েরা লিয়নের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণিত যোগ্যতার জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থেকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন। আমার মনোবেদনার কথা তাকে জানালাম। তাকে বললাম, আমি আর কোনোরকম সামরিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী নই। এমনকি রাজনীতিবিদদের প্রতিশ্রুতিতেও না। জেনারেল বললেন, 'আইভান, আমি তোমার অনুভূতির কথা বুঝতে পারছি। আমি জানি এদেশে শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তুমি আমাদের কী পরিমাণ সাহায্য করেছ, যা তোমার নিজেরই দেশ। তবে তোমার একটি জিনিস জেনে রাখা উচিত যে তোমার মত একজন লোককে কারও পক্ষে সাহায্য করা কতটা দুঃসাধ্য, কারণ তোমার অবস্থা এখন যেরকম তাতে লোকে ভাববে ভবিষ্যতে যে কেউ তোমাকে ব্যবহার করতে পারে যদিও তুমি ভাবছ তুমি আর্মি ছেড়ে দেবে এবং স্কুলে ফিরে যাবে!' এরপরও জেনারেল বলেছিলেন, আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং যতদিন তিনি সিয়েরা লিয়নে আছেন ততদিন আমি যা চাই তা পাওয়ার জন্য নিজস্ব প্রভাব ও ক্ষমতার অধীনে সম্ভব সবকিছু করবেন।

আমি শিখতে চাই ও করতে চাই এমন কিছু খুঁজে বের করতে তিনি আমাকে বললেন। দুদিন পর আমি জেনারেলকে এসে জানালাম, আমি একটা কম্পিউটার ইন্সটিটিউট খুঁজে পেয়েছি যাতে আমি ভর্তি হতে চাই। ওদের সব শর্তের কথা জানানোর পর তিনি আমাকে ভর্তি হওয়ার জন্য টাকা দিলেন। একই সময়ে জেনারেল আমাকে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাজকর্ম চালিয়ে নেয়ার জন্যও পরামর্শ দিলেন। কারণ তখনও ফ্রি-টাউনের উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণের ব্যাপক আশঙ্কা ছিল। জেনারেল আমাকে বলেছিলেন, এই দেশে যে কারও চেয়ে আমাকেই তিনি বেশি বিশ্বাস করেন। তার কারণেই আমি আবার কাজ করতে শুরু করলাম। এই দফায় আমি আমার সকল সামরিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কেবল তার কাছেই দায়ী ছিলাম এবং আবারও আমার জীবন স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলল।

এসময় অ্যাকশান এইডের একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হিসেবে 'ইয়ুথস ইন ক্রাইসিস' নামের প্রজেক্টে আমাকে খণ্ডকালীন চাকরি দেয়া হল। আমি তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেনিং ওয়ার্কশপের একটি সেন্টারে চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করলাম। প্রশিক্ষণ সফলভাবেই এগিয়ে চলল এবং আমরা পশ্চিমাঞ্চলে কাজ শুরু করলাম। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সিয়েরা লিয়নের যুবকদের

BanglaBook.org

বাস্তব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, যে কারণে অধিকাংশ যুবক নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেছে। এই প্রজেক্ট আরম্ভ করা হয়েছিল অ্যাকশান এইড, ইউনিসেফ, কনসিলিয়েশান রিসোর্সেস, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায়। ভাতা হিসেবে আমাদেরকে ভালো পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়। বেসামরিক লোকদের সাথে কাজ করতে আমার ভালোই লাগল এবং কাজের ধরনের জন্য আমি ভীষণ আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। কারণ এখানে অপছন্দনীয় কিছু করতে আমাকে বাধ্য করার কেউ ছিল না। যদিও চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছিলেন তথাপি আমি সামরিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ কোনো আগ্রহ অনুভব করছিলাম না। ১৯৯৮ সালের কোনো এক সময় মেজর কুলা, কর্নেল জেমস কাঙ্গা এবং আরও ৩৪ জনকে কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হল। এই খবর জানার পর আমি জেনারেলের কাছে ফিরে এলাম এবং আমার স্বার্থে মেজর কুলাকে রক্ষা করার জন্য তার দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলাম। জেনারেল বললেন, তিনি একজন সৈনিক এবং সত্যিকার অর্থে সিয়েরা লিয়নে চাকরিরত বিদেশি মাত্র, যার হাতে সিয়েরা লিয়নের আদালতের দেয়া সিদ্ধান্তকে পাল্টানোর কোনো ক্ষমতাই নেই। এছাড়া সব দেশে কেবল প্রেসিডেন্টের হাতেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের ক্ষমা প্রদর্শনের বিশেষ অধিকার থাকে। অবশ্য জেনারেল বললেন, যদিও তাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে তথাপি তাদের হত্যা নাও করা হতে পারে। আমি তখন আমার স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে এলাম এই আশায় যে তার উপর খারাপ কিছু ঘটবে না।

১৯৯৮ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন জেনারেল আমাকে জানালেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই দিনই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ১৪ জন সেনাসদস্যকে হত্যা করা হবে। আমি জানতে চাইলাম এর মধ্যে মেজর কুলার নাম আছে কি না। তিনি বললেন, হ্যাঁ। শুনে আমি কান্না আটকে রাখতে পারলাম না। একটু পর আমি তাকে মেজর ম্যাক্স কাঙ্গা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ সেও এদের মধ্যে আছে। আমি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লাম। তখন জেনারেল আমাকে বললেন, আমি সত্যিই একটি ছোট বালক! কারণ, তার মতে, এত সামরিক প্রশিক্ষণের পরও আমি সৈনিকের মত ব্যবহার করছিলাম না। তিনি সেদিন দুপুর একটার দিকে আমাকে নিয়ে কোনো এক জায়গায় যাওয়ার কথা বললেন। আমি জানতে চাইলাম কোথায়, তিনি শুধু এতটুকু বললেন আমি যা দেখতে পাব তা আমাকে একজন সৈনিকের হৃদয় উপহার দেবে। আমরা বাসা থেকে বের হলাম এবং গডরিচে সপ্তম ব্যাটালিয়ন মিলিটারি ব্যারাকের ফায়ারিং রেঞ্জে গেলাম। আমরা গাড়ি থেকে নেমে অন্যান্য মিলিটারি অফিসারের সাথে

BanglaBook.org

সিয়েরা লিয়নের বিদ্রোহীরা এই শিশুটির পা কেটে নিয়েছে

দাঁড়ালাম। দুই মিনিটের কম সময়ের মধ্যে আমি ২৪ জন সৈনিককে দেখতে পেলাম যাদের মুখে কালি মেখে এবং শরীরে সবুজ লতা-পাতা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করা হয়েছে। তারা নিকটস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করল। আমি আবার জেনারেলকে কী হচ্ছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে ধৈর্য ধরতে ও অপেক্ষা করতে বললেন। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কী হতে পারে! দশ মিনিট পর আমি একটি সামরিক ট্রাকের শব্দ শুনতে পেলাম। যখন ট্রাকটা কাছে এল তখন শুনলাম এর ভেতরের লোকগুলো গসপেল-সঙ্গীত গাইছে। কী ঘটতে যাচ্ছে তা দেখার জন্য আমি অবাক হয়ে অপেক্ষা করলাম। কয়েক মিনিট পর ট্রাকখানা আমাদের সামনে প্রায়

BanglaBook.org

দশ মিটার দূরত্বে এসে দাঁড়াল। ওরা ট্রাকের পেছনটা খুলে দেয়ার পর আমি মেজর কুলা এবং অন্যদেরকে নেমে আসতে দেখলাম। আমি বুঝলাম এখনই তাদেরকে হত্যা করা হবে। ২৩ জন পুরুষের পরনে ছিল কালো হাফ প্যান্ট ও জামা, যার সামনে পিছনে ইংরেজি 'সি' অক্ষরটা লেখা ছিল। একমাত্র মহিলা হিসেবে মেজর কুলা সাম্বার পরনে ছিল ঘিয়ে রঙের পোশাক। তারা তখনও পবিত্র সঙ্গীত গাইছিলেন। তাদেরকে ২৪টি ড্রামের উপর দাঁড় করানো হল। এরপর ঘিয়ে রঙের প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়ে তাদের চেহারা ঢেকে দেয়া হল। এবার তাদেরকে প্রশ্ন করা হল কেউ কোনো কিছু বলতে চায় কি না। বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলল। কিন্তু মেজর কুলা কিছুই বলতে পারলেন না। এর পরবর্তী পাঁচ মিনিটে আমি দেখলাম ২৪ জন সবুজ ইউনিফর্ম পরা সৈনিক জঙ্গল থেকে বের হয়ে এল এবং ড্রামের উপর দাঁড়ানো একেকজনের সম্মুখে একেকজন দাঁড়াল। তারা তাদের হাতিয়ার প্রস্তুত করল। এক মিনিট পর আদেশ দেয়া হল 'ফায়ার!' সৈনিকরা বিশ সেকেন্ড ধরে অনবরত ফায়ার করল। তাদের ফায়ারিংয়ের ফলাফল দেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের অজান্তেই আমার চোখ বন্ধ হয়ে এল। পরে যখন জেনারেল, সিনিয়র অফিসারগণ এবং ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখছিল ওরা মারা গেছে কি না আমি তখন প্রচণ্ড দুঃখে ও বেদনায় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে মাথা নুইয়ে ছিলাম। কাজ শেষ হলে জেনারেল আমাকে বললেন, চল যাই। এ ঘটনার পর আমি সেনাবাহিনীর উপর আরও বেশি তিক্ত হয়ে উঠি। অবশেষে আমি সবকিছু ভুলে থাকার সিদ্ধান্ত নিই এবং কম্পিউটার কোর্স ও অ্যাকশান এইডের কাজের ভিতর মনোনিবেশ করি।

ওই বছর নভেম্বরের কোনো এক সময় অ্যাকশান এইড আমাকে জানাল যে ইয়ুথস ইন ক্রাইসিস প্রজেক্টের কিছু অন দ্য স্পট সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনার আয়োজন করার জন্য আমাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী বো এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী কেনেমায় যেতে হবে। কেনেমা হয়ে বো যাওয়ার জন্য বাস এবং ল্যান্ডরোভার জিপে বোঝাই হয়ে আমরা রওনা হলাম। এই ভ্রমণ ছিল সত্যিই আনন্দদায়ক। আমরা নিরাপদে কেনেমা পৌঁছুই এবং কাজ করতে শুরু করি। আমাদের কাজগুলো ছিল এরকম কোনো এলাকার যুবকদের নিয়ে ওই এলাকার মানচিত্র আঁকা, ওই এলাকার যুবকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে লিখে রাখা, এলাকায় মনোরঞ্জনমূলক যেসব কাজ চালু আছে তা চিহ্নিত করা ইত্যাদি। আমার গ্রুপ ছিল 'এ'। যার পরিচিতিমূলক নাম ছিল 'ওইজি ওয়াজ্জা'। আমাদের গ্রুপটা ছিল সবচেয়ে জীবন্ত এবং আমাকেও সবাই ওইজি ওয়াজ্জা বলে ডাকত। কেনেমাতে আমাদের এই তাৎক্ষণিক আলোচনার কাজটি ভালোভাবেই এগিয়ে যায় এবং

BanglaBook.org

আমরা পরে একই কাজের জন্য সিয়েরা লিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বোতে চলে যাই। সেখানেও আমরা যুবকদের সংগঠন ও গ্রুপগুলির সাথে সফলভাবেই কাজ করলাম। যা-ই হোক, '৯৮-এর ডিসেম্বর মাসে বো ও কেনেমাতে কাজ শেষ করে আমাদের দলের ফ্রি-টাউনে ফিরে আসার কথা। কিন্তু বো এবং ফ্রি-টাউনের সংযোগকারী মহাসড়কটি বিদ্রোহীরা বিচ্ছিন্ন করে দিল, কারণ তখন দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ইকোমগ ও এএফআরসি/আরইউএফ বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল। তাই আমরা এই রাস্তা ব্যবহার করে ফ্রি-টাউনে ফিরে যেতে পারলাম না। আমাদের একটি বাণিজ্যিক বিমানে করে হেস্টিংস এয়ারফিল্ডে আসতে হল। পরে ইউনিসেফের বাস আমাদেরকে এয়ার ফিল্ড থেকে নিয়ে গেল।

ফ্রি-টাউনে ফিরে আসার পর আমাকে জরুরি ভিত্তিতে ডিফেন্স হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠানো হল। কারণ তখন শহরের উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণের মারাত্মক আশঙ্কা বিরাজ করছিল। সেখানে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ আমাকে বললেন, ইকোমগ বাহিনীর শহর রক্ষার জন্য আমার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এর মধ্যেই আমি কাব্বাহ সরকারের উপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে পড়েছি। কারণ তারা আমাকে স্কুলে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মেজর কুলার মৃত্যুর কারণে, যিনি আমার কাছে ছিলেন মায়ের মত, আর্মির ব্যাপারেও আমি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু জেনারেলের ভালো কথাবার্তা এবং আমার প্রতি তার ব্যক্তিগত সাহায্যের কারণে আমি তাদের সাথে সহযোগিতা করি। বিদ্রোহীরা সঙ্কল্প করেছিল বড় দিনের উৎসবের সময় ফ্রি-টাউন আক্রমণ করবে। আমি এবং চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ সারা রাত শহরে প্যাট্রলিং করতাম। আমরা যখন শহর প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত তখন শহর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থানকারী বিদ্রোহীরা ক্রমশ শহরের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ইকোমগ ও অগ্রসরমাণ বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল। এইসব কারণে আমাকে আবার ইউনিফর্ম পরতে হল এবং নিজ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হল। ৩১ ডিসেম্বরের আগেই বিদ্রোহীরা ফ্রি-টাউনের চতুর্দিকের গ্রামগুলি দখল করে নিল। তখন তারা ছিল শহর থেকে মাত্র সতের কিলোমিটার দূরে। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্গেমা ট্রেনিং সেন্টারে অবস্থানকারী ইকোমগ বাহিনীর সাথে জান্তা-বিদ্রোহী জোট বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই যুদ্ধের সময় লে. কর্নেল এস এ জে মুসা নিহত হলেন। আমি আগেই বলেছি, এস এ জে মুসা ছিলেন আমার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কর্মকর্তা এবং আমি তার ভীষণ অনুগত ছিলাম। তার মৃত্যু আমাকে প্রচণ্ডভাবে

BanglaBook.org

নাড়া দিল। সেদিন থেকেই ইকোমগ ডিফেন্স হেড কোয়ার্টারের কাছে এই বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হার জিৎ যা-ই হোক না কেন বিদ্রোহীরা ফ্রি-টাউন আক্রমণ করবেই, কারণ রাজধানীর ডিফেন্স লাইন এর মধ্যেই ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। ২রা জানুয়ারি তারিখে আমাদের বাহিনী ও এএফআরসি/আরইউএফ জোট বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরও ঘনীভূত হল। এই যুদ্ধের সময় আমাদের গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গেল যে, আত্মসমর্পণকারী অধিকাংশ সৈনিকই, যারা ইকোমগের পাশাপাশি যুদ্ধ করছিল, এখন তাদের পূর্বেকার সহকর্মী এবং ব্যক্তিগত বন্ধুদের সাথে এএফআরসি/আরইউএফের পক্ষে যোগ দিতে শুরু করেছে। এ তো যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা! একারণে সন্দেহভাজন সৈনিকদের বন্দি করে রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট চিফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল খোবেকে আদেশ দিলেন। এই আদেশের উপর ভিত্তি করে জেনারেল অতি দ্রুত এ ধরনের সবগুলো সৈনিককে, যারা একবার দলত্যাগ করে পরে আবার আত্মসমর্পণ করেছিল, বন্দি করলেন। এরা ইকোমগের পক্ষেই যুদ্ধ করছিল। পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে সে এক জটিল ও বিভ্রান্তিকর অবস্থা! যা হোক আমাদের মত ক'জন যাদেরকে সরকার ও ইকোমগের অত্যন্ত অনুগত গণ্য করা হত শুধু তাদেরকেই বাদ দেয়া হল। ১৯৯৯ সালের ৫ই জানুয়ারি পরিস্থিতি অত্যন্ত টান টান হয়ে গেল এবং সেদিন বিকালেই তাৎক্ষণিকভাবে একটি মিটিং ডাকা হল। আমাদের মত ইকোমগ-অনুগতদের নতুনভাবে ওয়্যারলেস সেট বা যোগাযোগের যন্ত্রপাতি, গাড়ি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইস্যু করা হল। এরপর চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ আমাকে প্যাট্রল কমান্ডার নিযুক্ত করলেন এবং আমি শহরে প্যাট্রলরত আলফা ও ব্রাভো কোম্পানির দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। ডিউটি ছাড়া কোনো সৈনিককেও রাস্তায় পেলে তাকে বন্দি করার ক্ষমতা আমার কোম্পানিকে দেয়া হল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

যুদ্ধাহতের মিছিল

১৯৯৯ সালের ৫ই জানুয়ারি রাত আটটার দিকে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি আমার ডিউটি শুরু করি। তখন আমার অধীনে ছিল নাইজেরীয় সেনাবাহিনীর ১৮৯ জন সৈনিক এবং আমার প্রিয় ও অনুগত ৩২ জন চাইল্ড সোলজার। মধ্যরাত নাগাদ নিরাপত্তার অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। সেই রাত্রে ফ্রি-টাউনের রাস্তাগুলোতে যে ধরনের ভীতিকর অবস্থা ফুটে ওঠে তা আমার পক্ষে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা রাতের নীরবতাকে ভয়াবহ করে তোলে। নিরাপত্তা পোস্টগুলোতে সৈনিকরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীরা ছিল একেবারেই নাছোড়বান্দা। তারা রাত দু'টা নাগাদ ফ্রি-টাউনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ রচনা করে। এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পাহারারত দু'শতাধিক নাইজেরীয় সৈন্যকে পরাভূত করে ওরা পাদেমবা রোডস্থ কারাগারটি দখল করে নেয়। ওখানে তখন চার হাজারেরও বেশি সিয়েরা লিয়ন সেনাবাহিনীর সৈনিক বন্দি অবস্থায় ছিল। সরকারি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এরা বিদ্রোহীদের সরাসরি সহায়তা করেছে বলে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। বিদ্রোহীরা কারাগার খুলে দিলে ওই সকল বন্দি সৈনিক বের হয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। এদের মধ্যে অনেক শাস্তি পাওয়া সৈনিকও ছিল যারা বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। ইকোমগ সমর্থিত সরকারি সৈন্যদের বিপক্ষে বিদ্রোহী ও কারামুক্ত সৈনিকদের মিলিত বাহিনী একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা ফ্রি-টাউনের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয়। অবশ্য শহরের অংশবিশেষ তখনও সরকারি বাহিনীর দখলে রয়ে যায়। শহরের পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন করা এক হাজারেরও বেশি নাইজেরীয় সৈনিক নিখোঁজ বা মিসিং ইন অ্যাকশান হয়ে গেল। এদের ব্যাপারে কোথাও কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। স্পষ্ট বোঝা গেল তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে আমি একটি কনভয় নিয়ে জেনারেলের বাসস্থানে গেলাম এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা বুঝিয়ে বললাম। তার মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না। তিনি ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, উদভ্রান্ত ও উত্তেজিত। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন বা বলবেন তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কারণ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা তার বাহিনীকে পরাভূত করে আবারও শহরে প্রবেশ করেছে। কয়েক মিনিট পর

BanglaBook.org

জেনারেল আমাকে অত্যন্ত তেজের সাথে বলে উঠলেন, 'আমাদের এখন একটাই পথ খোলা আছে, তা হল যুদ্ধ করা। আর এইসব অশিক্ষিত ও মানবিক বোধহীন বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে যুদ্ধ করে মরাই হবে উত্তম।' তিনি ছিলেন ভীষণ হতাশ কিন্তু আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করার জন্য গলায় শেষ শক্তিটুকু ঢেলে তিনি এই কথাগুলো বললেন।

যদিও মিলিটারি অপারেশনে সাফল্য দেখিয়ে এবং ভালো কাজ করে কর্তৃপক্ষ বা দেশের কারও প্রশংসা পাওয়ার কোনো আগ্রহ আমার মধ্যে তখন ছিল না, তবু আমার নিজের ও আমার সহকর্মীদের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে যুদ্ধ করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায়ও ছিল না। ওই দিন ভোর ছয়টার আগেই বিদ্রোহীরা রাষ্ট্রীয় ভবন, সমুদ্রবন্দর এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক এলাকাসহ রাজধানীর শতকরা ৬০ ভাগ এলাকার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। এই কারণে নাইজেরীয় নেতৃত্বাধীন ইকোমগের অধিকাংশ সিনিয়র মিলিটারি অফিসার ফ্রি-টাউনের সমুদ্রবন্দরে অপেক্ষমাণ তাদের নৌবাহিনীর জাহাজে গিয়ে উঠলেন এবং রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন। যেহেতু ওই দিন প্রতি সেকেন্ডেই অবস্থার অবনতি হচ্ছিল তাই চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল খোবে প্রেসিডেন্ট কাব্বাহকে নিয়ে শহর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী নদী পাড়ি দিয়ে লুঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই অবস্থা দেখে অধিকাংশ নাইজেরীয় সেনাসদস্য সকল আশা ও সাহস হারিয়ে ফেলে এবং তারা বিদ্রোহীদের উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ না করে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শন করেই যাচ্ছিল। এদিকে আমরা সিয়েরা লিয়ন সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকরা সকল সাহস ও তেজ-বীর্য নিয়েই যুদ্ধ করে যাচ্ছিলাম, কারণ আমরা জানতাম পরাজিত হলে বিদ্রোহীরা আমাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না। প্রাণ বাঁচাতে হলে যুদ্ধই একমাত্র পথ। যুদ্ধ এতটাই তীব্রতা অর্জন করে যে আমার মত কেউ বেঁচে থেকে আজ এই কাহিনী বলাটা শুধু সৃষ্টিকর্তার দয়াতেই সম্ভব হয়েছে। এটি ছিল গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমার অংশ নেয়া বা দেখা যুদ্ধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সশস্ত্র সংঘর্ষ। আমাদের এই প্রাণপণ প্রতিজ্ঞার কারণে দু'দিকেই হতাহতের সংখ্যা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যায়। তা দেখে অধিকাংশ সৈনিক নিজেদের ইউনিফর্ম খুলে ফেলে দিয়ে পালাতে শুরু করে। কিন্তু আমরা ছিলাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক পর্যায়ে আমরা শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে কিছু কিছু ভূমি দখল করতে শুরু করি। ইতোমধ্যে বিদ্রোহীরা শহরের শতকরা ৭৫ ভাগই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদেরকে সহায়তা দানকারী পাঁচ শতাধিক সিভিল মিলিশিয়া বা সিডিএফ সদস্যকে হত্যা করে। এ কারণে অবশিষ্ট মিলিশিয়ারাও সাহস হারিয়ে ফেলে এবং প্রাণ বাঁচানোর

BanglaBook.org

জন্য পালাতে শুরু করে। যুদ্ধ চলতে থাকলে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ নাইজেরীয়সহ আমার বেশ কিছু বন্ধু নিহত হয়। তখন আমার মনে হল, যে কোনো মুহূর্তে আমিও মৃত্যুবরণ করতে পারি।

সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য সিয়েরা লিয়নের বিদ্রোহীরা
এভাবে হাত কেটে নিয়েছে অনেক মানুষের

আমি চিৎকার করে আমার অন্যান্য সৈনিককে অগ্রসর হয়ে বিদ্রোহীদের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার আদেশ দিলাম। আমরা বেপরোয়া ও ভয়লেশহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকলাম। দুপুর একটা থেকে দু'টার মধ্যে ফ্রি-টাউনের পশ্চিমে

কঙ্গোভেলি ব্রিজ এলাকায় যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। আমি দৌড়ে ব্রিজের নিচে চলে গেলাম এবং জেনারেলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বললাম, শত্রু আমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠেছে এবং আমাদের বিমানবাহিনীর সহায়তা দরকার। বোমারু বিমান পাঠিয়ে এক্ষুনি শত্রুর অবস্থানের উপর বোমা বর্ষণ করা প্রয়োজন। যোগাযোগের পর আমি বেরিয়ে এলাম এবং আমার একটি ছেলের হাত থেকে রকেটচালিত গ্রেনেড লঞ্চার নিয়ে নিজেই তা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। আমি আমার জ্যাকেট খুলে ফেললাম এবং তা আমার মাথায় পেঁচিয়ে নিলাম। আমাকে অনুসরণ করার জন্য সহকর্মীদের নির্দেশ দিলাম। আমরা এলোপাতাড়ি ফায়ার করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলাম এবং বিদ্রোহীদেরকে জাতীয় স্টেডিয়ামের দিকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলাম। ওদের একটি দল পাহাড়ের উপর দিয়ে কিং হারমন রোড হয়ে পিছন থেকে এসে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে চতুর্দিক ঘিরে ফেলল। আমরা ওদের চতুর্মুখী আক্রমণের শিকার হলাম। আমাদের দলের অগ্রসরমাণ ১৭০ জনের মধ্যে এই হত্যাযজ্ঞে আমরা কেবল ১৭ জন বেঁচে রইলাম। বাম হাতে ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আমিও পড়ে গেলাম। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দয়ায় এবং সামরিক অভিজ্ঞতা থাকায় আমি ইউনিফর্ম ছিঁড়ে তা দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে নিতে সক্ষম হলাম। এই ১৭ জনের মধ্যে আমিই কেবল গাড়ি চালাতে জানতাম। বেঁচে যাওয়া নয়জন চাইল্ড সোলজার এবং সাতজন নাইজেরীয় সৈনিক ক্রলিং করে আমাদের পিছনে পিছনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহনকারী জিপের নিচে এসে গেল। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধু আবু জাওয়াদ, সিলভার স্টার ও জেমস চিৎকার দিয়ে আমি আহত অবস্থায় পড়ে গিয়ে যেখানে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলাম সেখানে ছুটে এল। তারা আমাকে তুলে নিয়ে জিপের সামনের আসনে বসিয়ে দিল। আমি কষ্ট করে জিপ স্টার্ট দিলাম। রাস্তার উপর পড়ে থাকা এতগুলো মৃতদেহের মধ্যে ইউ-টার্ন নেয়াটা দুষ্কর ছিল। রিভার্স গিয়ারে গাড়ি চালানোটাই ছিল একমাত্র উপায়।

জিপের উপর একটি জিপিএমজি মেশিনগান মাউন্ট করা ছিল। আমার বন্ধু জাওয়াদ সাহসিকতার সাথে ওটার উপর চড়ে বসল। সে মেশিনগান চালাতে থাকল আর আমি গাড়ি না ঘুরিয়ে একশ' বিশ মাইল গতিতে রিভার্স গিয়ারে পিছনে নিয়ে এলাম। রাস্তায় অসংখ্য লাশ পড়ে আছে। এর মধ্য দিয়েই দুইশ' মিটারের মত দূরত্ব পার হওয়ার পর আমি গাড়ি ঘুরানোর সুযোগ পেলাম। জাওয়াদ মেশিনগানটা আমাদের সামনের কাঁচের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। আমরা সম্মুখের দিকে মৃতদেহের উপর দিয়েই গাড়ি চালাতে থাকলাম, যতক্ষণ না শত্রুর গণ্ডি থেকে বের হয়ে আমাদের সহকর্মীদের সাথে এসে মিলিত হলাম। যে গতিতে আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম তা দেখে

BanglaBook.org

আমাদের সহকর্মীরা শত্রু মনে করে আমাদের উপর ফায়ারিং করতে শুরু করল। কিন্তু কোনো প্রকার সামরিক দক্ষতার জন্য নয় বরং নিতান্তই সৃষ্টিকর্তার দয়ায় ও কপালগুণে আমরা বেঁচে গেলাম। শত্রুর বেষ্টনী পার হয়ে আমি চট করে জিপ থামিয়ে দিলাম। হঠাৎ ব্রেক করার কারণে আমার যে বন্ধু গাড়ির উপরে ছিল সে উড়ে গিয়ে জিপের বাইরে পড়ে গেল। ওখান থেকে আমাদের সহকর্মী চাইল্ড সোলজাররা দুজনকে অতিদ্রুত ৩৪ নম্বর মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে জরুরি ভিত্তিতে আমার উপর একটি জীবন-রক্ষাকারী অস্ত্রোপচার করা হল। আমাকে মিলিটারি হাসপাতালে নেয়ার পর নাইজেরীয় বোমারু বিমান শত্রুর উপর আক্রমণ শুরু করল। আমি যে জেনারেলকে বিমান পাঠিয়ে সাহায্য করতে বলেছিলাম এটি তারই ফল। এতে শত্রু ক্ষতিগ্রস্ত হল আর আমাদের সৈনিকরা শহরের সেই অংশে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে সমর্থ হল।

এদিকে বিদ্রোহীরা বহুবার চেষ্টা চালায় আমি যে মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম সেই অবস্থানের ব্যারাকগুলো দখল করতে। যতবার তারা এই চেষ্টা করে হাসপাতালের কর্মচারীরা ততবারই সকল রোগীকে ওখান থেকে সরিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের ডিফেন্স হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যায়। এই আনা-নেয়ার মধ্যে অধিকাংশ সঙ্কটাপন্ন রোগী মারা গেল। যা-ই হোক, অবশেষে ডাক্তাররা আমার উপর সার্জিক্যাল অপারেশন করতে পারলেন না, যেটাকে তারা গুরুতরভাবে জরুরি হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। তাই তারা সুপারিশ করলেন, আমার এই অপারেশন বিদেশেই করাতে হবে কারণ সিয়েরা লিয়নে এমন কোনো হাসপাতাল নেই যেখানে ইমেজ ইন্টেন্সিফায়ার আছে, যা আমার অপারেশনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাই ১৯৯৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হল। মিলিটারি হাসপাতালের খারাপ অবস্থার কারণে অনেক রোগীই মারা যাচ্ছিল বলে আমাকে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়া হয়। আমি ফ্রি-টাউনে ডা. এম বি ডাবোহ-এর প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হলাম। ডা. ডাবোহ এবং মিসেস ডাবোহ আমাকে তাদের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিনামূল্যে আমার চিকিৎসা চালিয়ে যান। কারণ আমার মেডিক্যাল বিল দেয়ার মত তখন কেউ ছিল না। সেখানে থাকাকালে আমি আমার সেই আমেরিকা-প্রবাসী মামার সাথে অনেক চেষ্টা করে যোগাযোগ করলাম যাকে আমি এর আগে খুঁজে বের করেছিলাম।

মামার সাথে শেষবার কথা হওয়ার পর থেকে আমার জীবনে যা যা ঘটেছে তার সবই তাকে খুলে বললাম। তখন তিনি আমাকে আমার মায়ের কাহিনী শোনালেন। তিনি আমাকে নিশ্চিত করলেন যে ১৯৯৬ সালে আমি গ্রামে গিয়ে যে মহিলার সাথে দেখা করেছি তিনিই ছিলেন আমার নানি। মামা জানালেন, তিনি আমার খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে ফ্রি-টাউনে যোগাযোগ

BanglaBook.org

করেছেন যাদের সাথে আমার নানি বসবাস করছিলেন। তিনি বললেন, তিনি নানিকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আমার বর্তমান অসুস্থতার জন্য আমারও নানির সাথে আমেরিকায় চলে যাওয়া উচিত। তিনি আমার ও নানির জন্য পাসপোর্ট ইত্যাদি তৈরি করতে বললেন এবং এই দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গিনিতে চলে যেতে বললেন। আমি তখনও বিছানা ছেড়ে চলাফেরা করতে পারছিলাম না। তাই মিসেস ডাবোহ আমার মায়ের মতই কষ্ট করে আমার ও নানির ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করিয়ে নেন। তার এই সহযোগিতার কথা আমি কখনও ভুলব না।

১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে আমরা সিয়েরা লিয়ন ছেড়ে গিনির কোনাক্রিতে এলাম। আমরা সেখানে পৌঁছানোর আগেই মিসেস নেনেহ ডাবোহ কোনাক্রিতে তার এক বান্ধবী হাজা এম'বালু কাব্বাহর সাথে টেলিফোনে কথা বলে আমাকে বিমানবন্দরে রিসিভ করার এবং সকল প্রকার সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করে রাখেন। সিয়েরা লিয়নের পরিস্থিতির কারণে ডাবোহ পরিবার তাদের ছেলের পড়ালেখা ও জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাকে গিনিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। সে কোনাক্রিতেই থাকত। আমরা কোনাক্রিতে পৌঁছার পর তাদের ছেলে শেখ ডাবোহ আমাকে ও আমার নানিকে এয়ারপোর্টে স্বাগত জানাল এবং হাজা বালুর বাসায় নিয়ে গেল। ক'দিন পর হাজা বালু আমাকে এক সিয়েরা লিয়নি মহিলা সার্জন ডা. গান্ধার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি গিনির এক মিলিটারি হাসপাতালে কাজ করতেন। এপ্রিল মাসে আমার মামা আমেরিকা থেকে আসা পর্যন্ত এখানে আমি চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাই। আমেরিকায় আমাদের অভিবাসী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র মামা সাথে নিয়ে এলেন। আমরা প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর সংযোগ করার পর তিনি ওসব ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টে জমা দেয়ার জন্য সাথে নিয়ে গেলেন। একই বছর জুলাই মাসে আমরা সেনেগালের ডাকারস্থ মার্কিন দূতাবাস থেকে একখানি চিঠি পেলাম। এতে অভিবাসী ভিসার জন্য আমাদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর বলে জানানো হল। ১০ সেপ্টেম্বর আমি আমার নানির সাথে কোনাক্রি থেকে ডাকার রওনা হলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৬ সেপ্টেম্বরে আমার সাক্ষাৎকারের ফলাফল ভালো হল না। তবে আমার নানি আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ভিসা পেয়ে গেলেন। আমার আরও কাগজপত্র তৈরির প্রয়োজন পড়ল। আমরা কোনাক্রিতে ফিরে এলে সেখান থেকে আমার নানি আমেরিকায় চলে গেলেন।

নানি চলে যাওয়ার পর আমি ফ্রি-টাউনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল সরকার ও আমার পরিচিত অন্য ব্যক্তিরা মামার সাথে মিলে আমার

BanglaBook.org

জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন যাতে আমি আমেরিকা গিয়ে জরুরি সার্জিক্যাল অপারেশনটা করাতে পারি। ফ্রি-টাউনে আমি চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ মেজর জেনারেল খোবের সাথে দেখা করলাম, যিনি আমাকে বরাবরই সাহায্য করতেন। তার কাছে আমি দেশ ছাড়ার পরের সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করলাম। জেনারেল আমাকে প্রেসিডেন্ট কাব্বাহর কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমার বিষয়টা তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্ট কাব্বাহ জেনারেলকে বললেন আমাকে যেন পদ্ধতিগতভাবে সঠিক নিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ আমাকে সেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে যেখানে আমি আহত হয়ে প্রথম ভর্তি হই। তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন আমার চিকিৎসা বিদেশে করাতে হবে নাকি দেশে করানো সম্ভব।

উগান্ডার গুলু এলাকার বন্দিশিবিরে সন্তান জন্ম দেয়া একজন অপ্রাপ্তবয়স্কা মাতা

জেনারেল আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার অবস্থা নির্ণয়ের জন্য ডাক্তাররা মেডিক্যাল বোর্ড বসালেন। ডাক্তাররা আবারও পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে আমার অপারেশন দেশে সম্ভব নয়, বিদেশেই করাতে

হবে। এরপর ডিরেক্টর অব ফোর্সেস মেডিক্যাল সার্ভিস আমার স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফলাফল ও মেডিক্যাল স্টেটমেন্টসহ চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ আমাকে ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার চিফ হিঙ্গা নরমানের কাছে নিয়ে গেলেন। ডিফেন্স মিনিস্টার আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে গেলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফকে পরামর্শ দিলেন যে বিদেশে চিকিৎসার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্টের বরাবরে আমাকে আমার মেডিক্যাল রিপোর্টসহ একখানা দরখাস্ত করতে হবে। আমি বাসায় ফিরে গিয়ে পরামর্শমত একখানা দরখাস্ত লিখলাম এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডিফেন্স মিনিস্টার ও চিফ অব ডিফেন্স স্টাফকে এর অনুলিপি দিলাম।

দু'সপ্তাহ পরেও প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে আমি জেনারেল খোবেকে আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত তা জিজ্ঞেস করলাম। জেনারেল বললেন, আমার উচিত হবে সরাসরি প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টারের সাথে সাক্ষাৎ করা, কারণ ওরা সকলেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে। আমি প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার মোমোদু কোরওমার কাছে গেলাম এবং আমার বিষয়টি ব্যাখ্যা করলাম। মি. মোমোদু বললেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ও ডিফেন্স মিনিস্টারের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন। আরও দু'সপ্তাহ পর আমি আবার তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে ডিফেন্স মিনিস্টারের কাছে নিয়ে দেয়ার জন্য একখানি চিঠি দিলেন।

এই চিঠি ডিফেন্স মিনিস্টার চিফ নরমানকে দিয়ে আসার দু'দিন পর আমি অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য আবার তার অফিসে গেলাম। আমি রিসেপশনে গিয়ে মিনিস্টারের সাথে সাক্ষাতের অনুরোধ জানালাম। ভদ্রমহিলা আমাকে একটি ফরম পূরণ করতে দিলেন। পূরণ করার পরে সেটি তিনি মিনিস্টারের কাছে নিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পর তিনি এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি তার পিছু পিছু মিনিস্টারের অফিসের পাশে একটি রুমে গেলাম, যেখানে একজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন সিভিল মিলিশিয়া গ্রুপ কামাজোরদের জন্য নিযুক্ত পাবলিক রিলেশান অফিসার হিসেবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, যুদ্ধের সময় কামাজোররা ছিল চিফ হিঙ্গা নরমানের নিয়ন্ত্রণে। সেই পিআরও আমাকে বললেন, মিনিস্টার তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় তারা আমার জন্য কী করতে পারেন! এ কথা শুনে আমি ভীষণ অবাক হলাম এজন্য যে ডিফেন্স মিনিস্টার আমার সমস্যার ব্যাপারে আমাকে কামাজোর পিআরওর সাথে কথা বলতে বলেছেন! তিনি নিজেই এ ব্যাপারে ভালোভাবে জানেন এবং এই সমস্যাটা এসেছে সরাসরি প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে। বিষয়টা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।

BanglaBook.org

আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মনে করেন ডিফেন্স মিনিস্টার আমার আসার ব্যাপারে জেনেও আমাকে আপনার শরণাপন্ন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং প্রমাণ হিসেবে তিনি আমাকে আমার ব্যাপারে ডিফেন্স মিনিস্টারকে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টারের লেখা চিঠি দেখালেন।

আমি অত্যন্ত নিরাশ ও আহত হলাম এবং অপমান বোধ করলাম। আমি উত্তেজিতভাবে তার হাত থেকে মিনিস্টারের পাঠানো চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে গেলাম। আমি জেনারেল খোবেকে গিয়ে এই ঘটনার কথা বললাম। শুনে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না যতক্ষণ না তাকে কামাজোর পিআরওর কাছে পাঠানো চিঠিখানা দেখালাম। জেনারেল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন কারণ এই বিষয়টি আগাগোড়াই তার জানা ছিল। তিনি ডিফেন্স মিনিস্টারকে টেলিফোন করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। জেনারেলের কাছে তার একটাই জবাব ছিল যে তিনি জানতেন না এটা আমি! জেনারেল বুঝতে পারলেন, আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে ডিফেন্স মিনিস্টারের কোনো আগ্রহ নেই। তাই তিনি তাকে বাদ দিয়ে আবার আমাকে সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে গেলেন এবং পুরো ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। আমার অবস্থা যে গুরুতর সেই বিষয়ও তিনি উল্লেখ করলেন। প্রেসিডেন্ট তখন তাকে সম্বোধন করে তার সরকারের নিকট একখানা দরখাস্ত করতে বললেন, যাতে বিদেশে সার্জিক্যাল অপারেশন করানোয় সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হবে। প্রেসিডেন্ট আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন যে তিনি এই চিঠিখানা ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আলোচনার জন্য উত্থাপন করবেন। আমি ওই দিনই বাসায় গিয়ে একখানা দরখাস্ত তৈরি করলাম এবং তা তার কাছে নিয়ে গেলাম। দরখাস্তের সঙ্গে আমি সবগুলি মেডিক্যাল রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র জমা দিলাম। সাথে আমার অতীত জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও যুক্ত করে দিলাম, যাতে ক্যাবিনেটের কাছে বিষয়টা গুরুত্ব পায়।

এক সপ্তাহের বেশি সময় চলে গেল। আমি কারও কাছ থেকে কোনো কিছু শুনলাম না। জেনারেল সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি দরখাস্তখানাকে অনুসরণ করবেন। তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাইলে প্রেসিডেন্ট তাকে জানান যে তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দেয়ার জন্য তার সেক্রেটারিকে দরখাস্তখানা দিয়েছেন। পরদিন সকালে আমি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি জেমস অ্যালির সাথে দেখা করতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমার সম্পর্কিত কোনো পত্র পেয়েছেন কি না। তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং বললেন, প্রেসিডেন্ট তাকে দরখাস্তখানা দিয়েছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দেয়ার জন্য। তবে তিনি আমার সমস্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ দরখাস্তটি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি যেন দু'দিন পর তার সাথে দেখা করি, তিনি কাগজপত্রগুলো খুঁজে দেখবেন।

BanglaBook.org

আমি দু'দিন পর সেখানে গেলাম। তিনি জানালেন যে তিনি তা পাননি। আমি তখন তাকে বললাম, 'জনাব! প্রেসিডেন্ট আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আপনাকে কী অনুরোধ করেছেন সে বিষয়ে আমার মোটেও কোনো আগ্রহ নেই এবং আপনাদের কারও সাথে আমার সমস্যা নিয়ে কথা বলতেও আমি আর ইচ্ছুক নই। আমি এখনই আমার মেডিক্যাল রিপোর্ট ও বাকি কাগজপত্র ফেরত চাই এবং আমি এই অফিস ছেড়ে যাওয়ার আগেই তা আমাকে দিতে হবে।' তিনি বললেন, দিনের কাজ শেষ হলে তিনি ওই কাগজগুলি খুঁজে দেখবেন এবং

লেবাননের দুই আরব শিশুকে মারণাস্ত্র হাতে দেখা যাচ্ছে

পেয়ে গেলে তিনিই তা জেনারেলের অফিসে নিয়ে যাবেন। রাগে আমার শরীর জ্বলে উঠল। আমি তার কলার চেপে ধরতে চেয়েছিলাম কিন্তু প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত নাইজেরীয় সৈনিকরা এসে আমাকে নিবৃত্ত করল। প্রেসিডেন্টের চিফ সিকিউরিটি অফিসার, এক নাইজেরীয় মেজর, এসে আমার সাথে কথা বললেন। তিনি আমার ব্যাপারে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং সব তিক্ততা ভুলে আমাকে বাসায় চলে যেতে বললেন। আমি বাসায় ফিরে এলাম এবং জেনারেলকে সব কিছু জানালাম। এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তা তিনি আমার কাছে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি আবার আমাকে প্রেসিডেন্ট লজে নিয়ে গেলেন এবং প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি জেমস অ্যালিকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন অ্যালি জেনারেলকে জানালেন যে কাউকে বিদেশে চিকিৎসা করানোর জন্য সরকারের হাতে এখন কোনো ফরেন কারেন্সি নেই। সত্যিকার অর্থে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আমাকে ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও পাঠিয়ে চিকিৎসা করানোর কোনো বিধানও নেই। যদি সরকার কোনোভাবে আমাকে সাহায্য করতে চায় তবে পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলেই একটি হাসপাতাল বা একজন ডাক্তার খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে বা যিনি আমার অপারেশন করতে সক্ষম। তিনি আরও বললেন, এ ধরনের আবেদনের জন্য যোগাযোগ করার অনুমোদিত একমাত্র সরকারি সংস্থা হল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তারাই এই চিকিৎসার জন্য সম্ভাব্য খরচের একটি প্রাক্কলন প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপন করবে। তখন প্রেসিডেন্ট এই বিষয়টি আলোচনার জন্য ক্যাবিনেটের নিকট উপস্থাপন করবেন। কোনো ব্যক্তির উপর এ ধরনের অপারেশন বাবদ সরকার সর্বাধিক মাত্র সাত হাজার ডলার খরচ করতে পারবে এবং সেই অর্থ কেবল প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো ডাক্তারকে বা হাসপাতালকে সরাসরি পরিশোধ করা হবে।

তখন জেনারেল জানতে চাইলেন এই প্রক্রিয়া কত সময় নিতে পারে? মি. জেমস অ্যালি বললেন, এতে অবশ্যই সময় লাগবে তবে সঠিকভাবে কতটুকু তা তিনি নিজেও জানেন না। তিনি শুধু তার অফিস সম্পর্কেই বলতে পারেন এবং এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিস সম্পর্কে নয়। জেনারেল তখন জেমস অ্যালির কাছে আমাকে চেনেন কি না তা জানতে চাইলেন। তিনি জবাব দিলেন, 'অবশ্যই তাকে চিনি।' জেনারেল বললেন, 'আমার মনে হয় না!' তখন তিনি নিজেই অত্যন্ত গদগদভাবে বলে গেলেন কীভাবে আমি সরকারের বর্তমান স্থিতাবস্থার জন্য, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ও ফ্রি-টাউনকে মুক্ত করার জন্য কাজ করেছি। এখন তারা যে অবস্থায় আছেন তার জন্য আমার ভূমিকা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা তিনি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন। সবশেষে তিনি জেনারেলকে

BanglaBook.org

বললেন, 'চেনা না চেনার কথা নয় বরং আমি তখন আপনার কাছে সরকারি কাজের সঠিক পদ্ধতিটাই ব্যাখ্যা করেছি মাত্র।' এরপর আমরা ওখান থেকে চলে এলাম।

এক মাস পরও আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো খবর পেলাম না। তখন জেনারেল নিজে মি. অ্যালির কাছে গিয়ে আগের হারিয়ে ফেলা আমার মেডিক্যাল রিপোর্টগুলি ফেরত চাইলেন। তিনি তাকে তা দিলেন এবং তিনি তা আমার কাছে নিয়ে এলেন। এরপর জেনারেল তার মিলিটারি অ্যাসিস্ট্যান্টকে আমেরিকায় আমার চিকিৎসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী ভিসার প্রার্থনা করে ফ্রি-টাউনস্থ আমেরিকান দূতাবাসের নিকট চিঠি লিখতে বললেন। এর যাবতীয় খরচ তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে রাজি ছিলেন। তিনি আমাকেও বললেন ফ্রি-টাউনস্থ আমেরিকান দূতাবাসের নিকট আমার গৃহযুদ্ধকবলিত অবস্থার কথা বর্ণনা করে একটি চিঠি লিখতে। আমি একটি চিঠি লিখলাম এবং আবেদনকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে আমার জন্য মামার দাখিল করা অভিবাসন পিটিশনের কথাও এতে উল্লেখ করলাম।

আমেরিকান দূতাবাস থেকে আমেরিকার স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিসা পাওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করে পাঠানো একটি চিঠি জেনারেলের হাতে আসে। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চিঠিগুলো তৈরি করে আমি তার হাতে দিলাম। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই দূতাবাস আমার এই সকল চিঠির জবাব দিল। জেনারেল আমাকে ইকোমগের সাথে কর্মরত পিএইর ম্যানেজার এক আমেরিকান ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক তখন বিদেশে যাচ্ছিলেন। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে তিনি জেনারেলকে বলে গেলেন তিনি ফিরে আসার পর এ ব্যাপারে সম্ভব সকল কিছুই করবেন। এরপর জেনারেল খোবে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং চিকিৎসার জন্য তাকে নাইজেরিয়া নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি আমাকে কিছু টাকা দিলেন, যাতে আমি সিয়েরা লিয়নস্থ মার্কিন দূতাবাসের সুপারিশ অনুযায়ী গিনিস্থ মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্য-পদ্ধতি সম্পন্ন করার চেষ্টা করতে পারি। তিনি বললেন যদি আমি গিনিতে ব্যর্থ হই তবে যেন সিয়েরা লিয়নে ফিরে আসি যাতে চিকিৎসা শেষে নাইজেরিয়া থেকে তার ফিরে আসার পর আমরা আরেকবার মিলিতভাবে চেষ্টা চালাতে পারি। তার শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটলে আমরা ১১ই এপ্রিল একই সাথে সিয়েরা লিয়ন ত্যাগ করলাম। তাকে নাইজেরিয়া নিয়ে যাওয়া হল আর আমি এলাম গিনিতে। গিনিতে থাকাকালীন আমি নাইজেরিয়া ও সিয়েরা লিয়নে তার পরিবার ও তার ইউনিটের লোকজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছি। ১৭ই এপ্রিল আমি ভিসা পেলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম ১৯শে এপ্রিল সিয়েরা লিয়ন ফিরে যাব।

BanglaBook.org

কিন্তু ১৮ই এপ্রিল আমি জানতে পারলাম, নাইজেরিয়াতে জেনারেলের মৃত্যু হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল অবিশ্বাস্য এবং অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ। কিন্তু আমার করার কিছুই ছিল না। আমি আবার মামার সাথে আমেরিকায় যোগাযোগ করলাম। সব কথা শোনার পর মামা বললেন, আমাকে সাহায্য করার মত অবস্থা বর্তমানে তার নেই। তবে ভবিষ্যতে কী করতে পারেন তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তিনি কিছু সময় চাইলেন। ওই সময় বাড়ি ফেরার জন্য আমার পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। তাই আমি সিয়েরা লিয়ন ফিরতে পারলাম না। কী করব বুঝতে না পেরে আমি নিরাশ হয়ে পড়লাম।

কচি বয়সে কোনো লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা না করেই আমার দেশের স্বার্থে এত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করার পরও এই যুবা বয়সে এসে আজ আমি চিকিৎসার অভাবে যুদ্ধের আঘাত নিয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে আছি। দেশ ফিরে যাচ্ছে শান্তি ও গণতন্ত্রের দিকে আর যুদ্ধের কারণে সব-হারানো এতিম আইভান ধুঁকে ধুঁকে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। মানবতাভরা বাকি পৃথিবী জানে কি এই কথা!

রশিদ পিটার্স নামে একজন চাইল্ড সোলজার এঁকেছে 'মা ও শিশু'

অ্যাম্বুশ পেতে জনগণের উপর ফায়ারিং করার ছবি এঁকেছেন
আর্নেস্ট ফুদে নামে এক চাইল্ড সোলজার

স্মৃতির কান্না

এ পর্যন্ত বর্ণিত আমার জীবনকাহিনীতে পৃথিবীর দেশে দেশে চলমান সহিংস ও সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে সকল শ্রেণীর শিশুদের যাবতীয় দুর্ভোগের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে শিশুদের সাহস, শিশু-অধিকার লংঘন, সশস্ত্র সংঘর্ষে বড়দের দ্বারা বিভিন্নভাবে শিশুদেরকে ব্যবহার, হিংস্রতা, শয়তানি এবং নানান দুর্ভোগের বহুমাত্রিক চিত্র। এই গল্পের নায়ক আমি আইভান ঠিক ততগুলো ধাপই অতিক্রম করেছি যা যুদ্ধের প্রয়োজনে একজন বালককে অতিক্রম করতে হয়। আমি এতিম হয়েছি, শরণার্থী হয়েছি আর পরিণত হয়েছি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে। আমি চাইল্ড সোলজারে পরিণত হয়েছি, যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধবন্দি হয়েছি, কারাগারের নির্যাতন সহ্য করে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। বিভিন্ন প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। জীবনের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা শিশু বয়সে আমার উপর আরোপিত হওয়ার কথা ছিল না। অথচ অনেকের মত আমিও তেমনই দুর্ভাগা একজন মানুষ যার শৈশব ও কৈশোর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পরিণত বয়সের মানুষের হিংসার আগুনে। আজ একুশ বছর বয়সে আমি আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছি যা আমার দশ বছর বয়সের পর থেকে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। অনেক বিষয় আছে যা আমি এখন বুঝতে পারি কিন্তু তখন এসব বিষয় বোঝার বয়স আমার হয়নি। অপরিপক্বতার কারণে আমি অতি সাধারণ অথবা দুষ্ট চরিত্রের লোককেও দেবতুল্য মনে করেছি। আমি যা কিছু দেখেছি, অনুভব করেছি এবং যেসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আজ তার সবকিছু লেখায় বা কথায় প্রকাশ করে বোঝানো সম্ভব নয়।

শিশু হিসেবে আমার জন্মগত অধিকার আমি হারিয়েছি এবং অন্য সব অধিকার হারানো শিশুদের দুর্ভোগ আমি দেখেছি। বড়রা আমাকে ব্যবহার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অপব্যবহার করেছে। এই সকল অভিজ্ঞতা আমাকে তখন ততটা আহত করেনি যেভাবে আজ করছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, অনেক লোকই মানবাধিকার, শিশু-অধিকার এবং নারী-অধিকার সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠিত। তারা এসব বিষয়ে কেবলই বাগাড়ম্বর করে বেড়ায়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা যে ধরনের জীবন-যাপন করে তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা নিজেদের স্বার্থকেই শুধু প্রাধান্য দেয়, অন্য কিছুকে নয়। এ কারণেই আমি আমার

BanglaBook.org

এবং এদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও শঙ্কিত। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত চাহিদা, বিশেষত আফ্রিকাতে, এত বেশি প্রবল যে তারা অবলীলায় জনগণের সম্পদকে একা অথবা অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে লুটে নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এরা নিজের তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দেশ ও জাতির সর্বনাশ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এদের সামনে কোনো মানবিক আইনই কাজে আসে না। অসংখ্য কনভেনশন, ফোরাম এবং কনফারেন্সকে ধন্যবাদ, যারা বিশ্বকে বিষয়গুলো জানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে আমার সন্দেহ হয় শুধু জানা এবং জানানোটাই এই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান কি না! মানুষরূপী এই সব শয়তানকে রুখতে না পারলে এবং ক্ষমতা ও বিচারের আসনে মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষগুলোকে না বসালে কীভাবে এসব সমস্যা দূরীভূত হবে, আমি বুঝতে পারি না। এখন আমার মনে হয়, ভালো এবং মেধাসম্পন্ন লোকদের রাষ্ট্র-শাসনের কাজে এগিয়ে আসা উচিত। আমার জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে চাপের মুখে বাধ্য করা না হলে মানব প্রকৃতি কোনো কিছুই মেনে নেয় না। সিয়েরা লিয়নে আমাদের মত কচি বয়সের শিশুদের যে পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে এবং বিশ্বের নানা দেশে আজও যেভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তার মূল কারণ হল প্রাপ্তবয়স্কদের স্বার্থপরতা, লোভ এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এরা আন্তর্জাতিক নিয়মনীতিরও তোয়াক্কা করে না!

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের অন্য অনেক শিশুর চেয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষে আমার অভিজ্ঞতা মোটেই ব্যতিক্রম কিছু নয়। বরং আমার পারিবারিক পটভূমি, আর্মিতে যোগ দেয়ার আগে আমার জীবনধারা এবং যে উৎসাহ ও সুযোগ আমি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বরাবরই পেয়েছি তা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তাই এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সাথে জড়িত অন্য হাজার হাজার শিশুর তুলনায় আমার অবস্থা অনেক ভালো ছিল। আমি আজ দিব্য চোখে দেখতে পাই পৃথিবীর শত শত চাইল্ড সোলজার কত মানবেতর জীবন-যাপন করছে!

আমার পারিবারিক অবস্থা ও চটপটে ব্যবহারের জন্য অনেক সময় আমি সেনা কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য লাভ করেছি এবং অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ খাতির যত্ন করেছেন। তাই বলা যায়, পরিবারের শিক্ষার মান ও আর্থিক অবস্থা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়। সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তানদের সাথে অশিক্ষিত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের যথেষ্ট তারতম্য চাইল্ড সোলজার হওয়ার পরেও থেকে গেছে। একই দলের চাইল্ড সোলজার হওয়ার পরও তারা যে ব্যবহার ও নিয়োগ পায় তার মধ্যে থাকে আকাশ-পাতাল তফাত। যে কোনো কারণে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ধনী পরিবারের সন্তানদের সুবিধাগুলো হচ্ছে, তারা খুব সহজেই সেনাবাহিনীর লোকদের প্রশংসাভাজন হয়ে

BanglaBook.org

যায় কারণ তারা চটপটে এবং দেখতে-শুনতে ভালো। একই কারণে তারা গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে খুবই সফলভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদেরকে সব সময়ই খুব স্পর্শকাতর মিশনগুলোতে ব্যবহার করা হয় বলেই কর্তৃপক্ষ কখনও তাদের নেশাজাতীয় দ্রব্যাদিতে অভ্যস্ত হতে দেয় না। কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সব সময়ই খুব ভালো অবস্থায় রাখে যাতে তারা শত্রুরও প্রশংসাভাজন হয়। এতে তাদের দায়িত্ব পালন সহজ হয়। এরা সবসময়ই ভালো সামরিক প্রশিক্ষণ অর্জন করে থাকে যা তাদেরকে খুবই সচেতন সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলে। তাই অন্য শ্রেণীর শিশুদের মত তারা তত সহজে মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় না এবং যখনই সুযোগ পায় খুব সহজে বেসামরিক জীবনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

সিয়েরা লিয়নের গৃহযুদ্ধের নির্মমতা ক্ষমা করেনি এই দুই নিষ্পাপ শিশুকেও

তবে এই শ্রেণীর শিশুদের অসুবিধাগুলো হচ্ছে, সামরিক কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে বলে এদের পালনকারী বাহিনীগুলো, তা আর্মি হোক অথবা অন্য কোনো বাহিনী, এদেরকে চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসের হেফাজতে ছেড়ে দিতে অনাগ্রহী থাকে। কোনো সংস্থার কাছে ছেড়ে দেয়ার পরও আর্মি এসব চাইল্ড সোলজারের পক্ষ থেকে সবসময় এক প্রকার ভয়ের আশঙ্কা করে থাকে। তাই

ওদের সামরিক বিষয়ক পড়াশোনায় পুনরায় ফিরে আসার জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয় বারবার। ওরা যদি সামরিক কর্মকাণ্ডে অনাগ্রহী হয় তবে শত্রুর কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়ার ভয়ে গোপনে তাদের হত্যা করাকে নিরাপদ মনে করা হয়। যুদ্ধের শেষে এদের সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কার কথাও একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না। যুদ্ধ শেষে বেসামরিক জীবনে ফিরে যাওয়ার পর যদি তাদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া না হয় তাহলে তারা দেশ ও সমাজের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে।

অন্যদিকে যুদ্ধের সময় প্রাণ বাঁচানোর খাতিরে যেসব দরিদ্র পরিবারের সন্তান সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তাদেরও সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। সুবিধাগুলো হচ্ছে, কষ্ট সহ্য করার পূর্ব-অভিজ্ঞতার কারণে তারা খুব সহজেই প্রতিকূল অবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। সেনা কর্তৃপক্ষও যুদ্ধের শেষে বিনা দ্বিধায় তাদেরকে ডিমোবিলাইজেশনের জন্য চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসের কাছে ছেড়ে দিতে রাজি হয়। মিলিটারি অপারেশনের ব্যাপারে তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না বলেই কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি মনোযোগও কম দেয়। অপর পক্ষে তাদের অসুবিধাগুলো হচ্ছে, কর্তৃপক্ষ সাধারণত তাদের মাদকদ্রব্য ও নেশায় অভ্যস্ত করে ফেলে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে যুদ্ধের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রথমে তাদেরকে পাঠানো হয়, শত্রুর মনোযোগ অন্যত্র আকৃষ্ট করার জন্য এ ধরনের চাইল্ড সোলজারদের দলকে ঝুঁকির মুখে শত্রুর বন্দুকের সামনে পাঠানো হয়। এমনকি কোনো কোনো এলাকায় চলাচলের পথে মাইন বিছানো আছে বলে সন্দেহ করা হলে সম্ভাব্য ঝুঁকির বলি হিসেবে এ ধরনের চাইল্ড সোলজারদেরই সৈনিকদের আগে আগে পাঠানো হয়। যদি কোনো মাইন বিস্ফোরিত হয় তাহলে তাদের কেউ নিহত হয় অথবা আহত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়। দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবার থেকে আসা চাইল্ড সোলজারদের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়। এতে তারা ব্যর্থ হলে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সাথে নিতান্ত অমানবিক ব্যবহার করা হয়।

দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবার থেকে আসা চাইল্ড সোলজারদের যুদ্ধ শেষে ডিমোবিলাইজড করে বেসামরিক জীবনে ফিরিয়ে নেয়াটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সকল কষ্ট সত্ত্বেও তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সেনাবাহিনীর জীবন তাদের দরিদ্রতার কষ্টপূর্ণ বেসামরিক জীবনের চেয়ে অনেক ভালো ও নিশ্চয়তাপূর্ণ। ডিমোবিলাইজেশন বা সশস্ত্র সংঘর্ষ থেকে বিযুক্তির পর তাদের নেশাগ্রস্ততার কারণে এবং বন্য সশস্ত্র জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। সুন্দর এবং ভদ্র জীবন-যাপনে তাদেরকে পুনর্বাসিত

BanglaBook.org

করার ব্যাপারে জনসাধারণও আগ্রহ দেখায় না। ফলে তাদের জন্য বেসামরিক জীবনযাপন শুরু করা অসম্ভব না হলেও দুষ্কর হয়ে পড়ে। গতানুগতিকতা বা কৌতূহলশূন্যতার কারণে এই শ্রেণীর শিশুদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এনজিও সংগঠনগুলোর পক্ষে তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সাথে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কী করা যায় তা নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ ওরা মনে করে ওরা

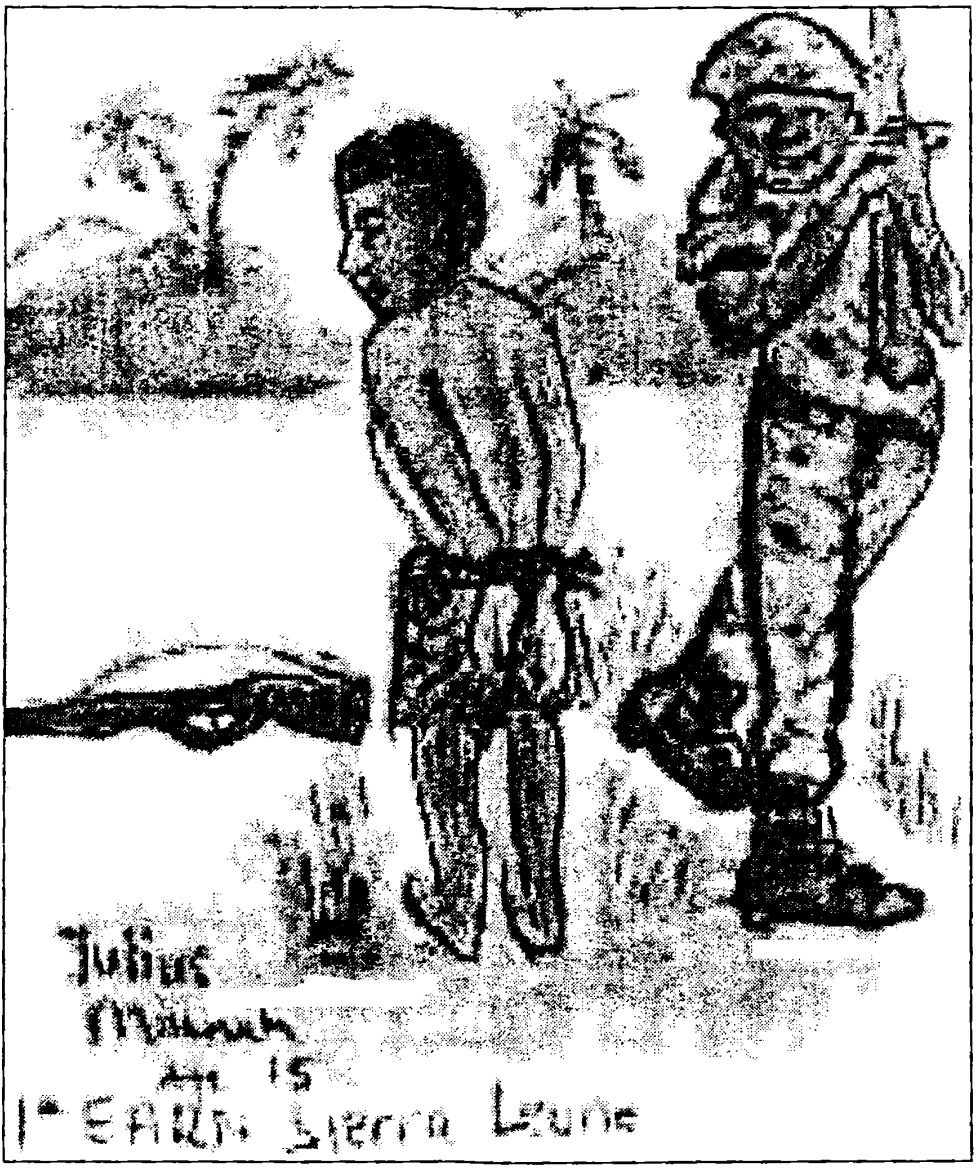

চাইল্ড সোলজারের পরিণতি—এঁকেছে জুলিয়াস মান্নাহ নামে একজন প্রাক্তন চাইল্ড সোলজার

যেভাবে আছে সেভাবে বেশ ভালোই আছে। যুদ্ধের শেষে দিনের পর দিন আর্মি ক্যাম্পে পড়ে থেকেও ওরা মা-বাবা বা ভাই-বোনদের ব্যাপারে কোনো কৌতূহল দেখায় না। আমার শত শত বন্ধু এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়ে আর্মিতেই রয়ে গেছে, যদিও তাদেরকে বর্তমানে আর্মির কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি তারা সাধারণ সৈনিকদের মত সুযোগ সুবিধাও পায় না।

আমার এই কথাগুলো শুধু সশস্ত্র সংঘর্ষের সাথে জড়িয়ে পড়া আমার মত শিশুদের অবস্থাকে বুঝতে সাহায্য করবে তা নয় বরং বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি নির্ধারকরাও শিশুদের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে তাদের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ও যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। যেন এই পৃথিবীর বাকি মানুষের মধ্যে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার যায় এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। কারণ যে জীবন একবার হিংস্রতা ও নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার ব্যাপারে আমার সর্বপ্রথম চিন্তা হল শান্তি ও নিরাপত্তা। আগামীদিন কী ঘটবে তা না জেনেই আমি প্রত্যেক রাতে ঘুমোতে যাই। কখনও কখনও আমি শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে যাই। কারণ এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গণঅসন্তোষের শিকার হাজার হাজার শিশু রয়েছে যারা নিরাপত্তাহীন ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

যখন বাকি পৃথিবী শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে যাচ্ছে তখন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক শিশু হিংস্রতা ও নেশার মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য বন্য জীবনে ফিরে যাচ্ছে। ওরাই হচ্ছে তথাকথিত শান্তিচুক্তির অজানা শিকার। ওরা তো বন্দুকের শব্দ ছাড়া আর কোনো শিক্ষাই অর্জন করতে পারেনি। ওরা পড়তে জানে না এবং তাদের নেতারা সন্ধির যে খসড়ায় সই করেছে তাও তারা বোঝে না। অথচ তা-ই নেতাদের বিলাসবহুল বাড়ি ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওদের জীবিকার প্রধান বাহন ছিল হাতিয়ার। ওরা সে হাতিয়ার সহজেই হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি কখনও। কিন্তু শান্তিচুক্তির নামে যখন তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছে তখন তারা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নিতান্তই নিরুপায় হয়ে। তাদের না আছে কোনো অভিভাবক, না আছে কোনো উপার্জনের পথ। যারা আহত বা বিকলাঙ্গ তাদের সুচিকিৎসার কোনো বন্দোবস্তও নেই। শুধু সিয়েরা লিয়ন কেন, সারা পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যারা তাদের সাহায্য করতে পারে। নষ্ট-পেশায় গিয়ে কেউ মৃত্যুর গলিতে ঘুরছে আর কেউ ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আমি হচ্ছি এসবের জীবন্ত সাক্ষী।

নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দীর্ঘ দশটি বছর কর্তৃপক্ষ আমাকে ব্যবহার করেছে। অথচ আজ আমি এভাবে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়ে আছি। যখন তারা দেখল, পেটে গুলির আঘাত নিয়ে আমি আর তাদের কোনো কাজেই

BanglaBook.org

আসছি না, তখন তারা আমাকে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এ কারণেই আমি মনে করি কিছু অশান্ত দেশে, বিশেষত আফ্রিকায়, যদি শান্তি ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকেই শুধু উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে চলবে না বরং যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে, যারা এর শিকার হয়েছে এবং এর পরেও বেঁচে আছে তাদের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে বিশ্বমানবতার।

আফ্রিকায় শান্তি অর্জন করা এজন্য অত্যন্ত দুষ্কর যে এখানে কেউ যুদ্ধের কারণগুলোকে মেনে নিতে চায় না এবং তারা তার সমাধান করতেও প্রস্তুত নয়। তাই এই মহাদেশকে যুদ্ধের মূল কারণগুলো থেকে রক্ষা না করে শান্তি অর্জন করা দুষ্কর হবে। মানবিকতার বৃহত্তম সম্পদ হচ্ছে শান্তি। এটি এমন একটি লক্ষ্য যার ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বে কোনো ঐকমত্য নেই। যে কোনো শান্তি-আলোচনাই সাক্ষ্য দেয় যে পৃথিবীতে যুদ্ধ আছে। বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধের উল্লেখ না করে শান্তি ব্যাখ্যা করা কষ্টকর। কেউ কেউ বলেন, শান্তি হচ্ছে যুদ্ধের অনুপস্থিতি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে শান্তির উপর জনগণের অধিকার বিষয়ক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে (ইউএন ১৯৮৪)।

একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে সত্যিকারে শান্তি গড়তে হবে মানবতাবাদের ভিত্তির উপর অর্থাৎ সত্য, মুক্তি, নিরাপত্তা এবং সুবিচারের উপর। যা-ই হোক আমি অবশ্য শান্তিকে যুদ্ধের অনুপস্থিতি হিসেবে দেখি না বরং এটা হল রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সহযোগিতার এক গতিময় পদ্ধতি, যার ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীনতা, স্বাধিকার, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সমতা, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান এবং জনগণের প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন। যদি শিশু-অধিকার সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশনকে সম্মান দেখানো হয় তাহলে প্রত্যেক সমাজের শিশুরাই শান্তি, ভালোবাসা ও সুসামঞ্জস্যের মধ্যে বেড়ে উঠবে।

গত তিন দশক ধরে আফ্রিকা মহাদেশের মানুষ অসংখ্য আন্তঃসীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে, যা যুক্ত হয়েছে মানবতার দুর্দশা ও সম্পদের ধ্বংস সাধনের সাথে। এই সকল চরম দুর্দশার প্রত্যক্ষ শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। বিগত বছরগুলোতে শিশু-অধিকারের উপর জেনেভা কনভেনশনের প্রচুর উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং উত্তম লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। জেনেভা কনভেনশনের লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের দুর্দশা দূর করা এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করা। এই কনভেনশন এখন জটিল কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের একটি সংকলনে পরিণত হয়েছে। শিশু-অধিকারের উপর এই কনভেনশন রাষ্ট্রের উপর একটি নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছে যে এই সকল আইন তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে বাধ্য থাকবে। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে সকল প্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও অনেক কিছু করতে বাকি রয়ে গেছে। কারণ অভ্যন্তরীণ আইনকে

BanglaBook.org

যুগোপযোগী করে শিশু-অধিকার সম্পর্কিত এই কনভেনশনের কার্যকারিতা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর গতি এখনও অত্যন্ত শ্লথ।

শিশুদের অধিকার জন্মগত এবং এক প্রজন্ম সময়কালের মধ্যেই যদি এই অধিকার তাদেরকে দেয়া হয় তাহলে এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ শান্তি ও স্থিতিশীলতা চলে আসবে। শিশু-অধিকারের নীতিমালা ও আইনগুলোকে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দুটি সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। তাদের একটি হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যটি সশস্ত্র বাহিনী।

শিশুদের চাইল্ড সোলজার হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে আইন তার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য সেনাবাহিনী। তাই এই আইন জানতে ও জানাতে সেনাবাহিনীর সদস্যগণ আইনত বাধ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। তাদের উচিত বিষয়টিকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে আধুনিক প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে কিছু নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করা। এছাড়াও শিশু-অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশনের উপর বেশি বেশি জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা। সশস্ত্র সংঘর্ষে শিশুদের ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রণীত আইনের প্রতি বর্তমানে যে অমনোযোগিতা দেখানো হচ্ছে তা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশপ্রেম বা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা বলে এসব শিশুকে যতই আদর্শিক বা মনস্তাত্ত্বিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করা হোক না কেন, এ ধরনের সবগুলো পদক্ষেপই আইনের পরিপন্থী। শুধু রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আইন নয়, মানবিক মানদণ্ডেও এসব নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। বর্তমানে মূল্যবোধের এই বিতর্কিত সময়ে শিশুদের সম্পর্কে অধিক সচেতনতার ফলে সারা বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। শিশু-অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষার জন্য বিরোধকালে প্রযোজ্য আইনগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

আজ প্রায় তিন লক্ষ শিশু দুনিয়াজোড়া বিভিন্ন দেশে সশস্ত্র সংঘর্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দেশগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা, কলম্বিয়া, লেবানন, রুয়ান্ডা, শ্রীলঙ্কা, উগান্ডা, বুরুন্ডি, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কঙ্গো, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিয়নসহ ত্রিশটির মত দেশ। ভেবে দেখুন, যদি প্রায় তিন লক্ষ শিশু চলমান সশস্ত্র সংঘর্ষের সাথে বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট থেকে দুর্দশা ভোগ করে থাকে তাহলে আরও কী পরিমাণ শিশু এসকল সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে বিভিন্নভাবে ও মানসিক বিপর্যয়ে কষ্ট পাচ্ছে। প্রত্যেকটি চাইল্ড সোলজারের মাতা-পিতা ও ভাই-বোন, নিকটাত্মীয় ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রত্যেকেই মানসিক কষ্টের মধ্যে থাকে। এটা তাদের জন্য গর্বেরও কিছু নয়। ওরা তো চায় ওদের শিশু বা কিশোরটি ওদের মাঝে ফিরে আসুক এবং লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করুক। এভাবে শিশু-কিশোরদের যুদ্ধে

BanglaBook.org

জড়ানোর ফলে একজনের কষ্ট দশজনের কষ্টে রূপ নিয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের আইন আছে কিন্তু তা সাহায্যকারী-আইন নয়! আজ অনেকেই শিশুদের ক্ষতিগ্রস্ততার কথা বলে থাকেন কিন্তু কে এই সব ক্ষতির কারণগুলোকে খুঁজে বের করে তার মূলোৎপাটন করবে? আজকাল কিছু কিছু সচেতন লোককে এ ব্যাপারে কথা বলতে দেখে আমার মনেও আশা জেগে ওঠে।

আমরা সফল হতে পারব না, যদি আমরা আইন ভালোভাবে না জানি এবং সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে একথা বিশ্বাস না করি যে এই আইন যুদ্ধের শিকার হয়ে যাওয়া শিশুদের সত্যিই রক্ষা করতে পারে এবং তাদের মনকে যুদ্ধ থেকে মানবতার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কারণ বড়দের চিন্তাধারাকে সহজেই গ্রহণ করার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার এক প্রকার স্বাভাবিক যোগ্যতা শিশুদের রয়েছে। যদি তাদের বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে বেড়ে উঠতে বাধ্য করা হয় তাহলে এই বিরোধপূর্ণ মানসিকতাই হয়ে যাবে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা হবে বিশ্বশান্তি, স্থিতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

এই বইতে আন্তরিকতার সাথেই আমার যুদ্ধলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা করেছি, যা আমার মত যুদ্ধের শিকার অন্য শিশুদের অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা কিছু নয়। আমি এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। কিন্তু আশা করি এতে বর্ণিত চিত্র অসংখ্য শিশুর যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা বর্ণনা করবে এবং শিশু-অধিকারকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিশিষ্ট ১

শিশু সৈনিক বা চাইল্ড সোলজার

নির্মম বাস্তবতা

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে। ক্ষমতা দখল বা বৃদ্ধির জন্য, নিজের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, অন্যের দ্রব্য হরণের জন্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মানুষ যুগে যুগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে মানুষের জান-মালের ক্ষতি হয় জেনেও মানুষ এ থেকে বিরত থাকতে পারেনি। আদিকালের মানুষ তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে বারুদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে যুদ্ধ ও সংঘর্ষে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। এতে দিনে দিনে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে মানুষের ক্ষতির দিকটা। যুদ্ধে মানুষ নিহত হয় অথবা পঙ্গুত্ব বরণ করে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যুদ্ধের কারণে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়ে দুঃস্বপ্নের কালে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধের পর কেউ বিজয়ের আনন্দে উল্লাস করে আর কেউ সর্বস্ব হারিয়ে হা-হুতাশ করে। কিন্তু ক্ষতি হয় সবারই। ক্ষতি হয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা নিরপরাধ জনগণের জান ও মালের। ক্ষতি হয় শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের। বারুদের গন্ধে বাতাস হয় দূষিত আর যুদ্ধাক্রান্ত এলাকার মাটি বারুদের বিষের মিশেল নিয়ে হয়ে ওঠে নিষ্ফলা।

এত ক্ষয়-ক্ষতির কথা জেনেও মানুষ যুদ্ধ করে। যুদ্ধবাজের ইচ্ছার শিকার হয়ে শান্তিকামী মানুষগুলোও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একেকজন মানুষের যুদ্ধ করার কারণ একেক রকম। কেউ ত্যাগের উদ্দীপনায় 'ন্যায়-যুদ্ধে' প্রাণ দিতে যায় আর কেউ 'অন্যায়-যুদ্ধে'র শিকার হয় নিতান্ত অসহায়ভাবেই। তবু যুদ্ধ হয়। অতীতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। যুদ্ধগুলোতে, তা গৃহযুদ্ধ হোক বা ব্যাপক আকারের আন্তঃদেশীয় যুদ্ধ, সংসার-সংশ্লিষ্ট পরিণত মানুষরাই জড়িত হয়, তা যেভাবেই হোক না কেন। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা যুদ্ধে যোগ দেয় নিতান্তই সৈনিক হিসেবে চাকরি করার জন্য অথবা আবেগতাড়িত হয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দেশ ও জনগণের সেবা করার জন্য। আবার যুদ্ধ করে ভাড়াটিয়া সৈন্যরাও। ইংরেজিতে বলা হয় 'মার্সেনারিজ'। ওরা যুদ্ধ করে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে শুধু ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্য। অন্যদিকে সাধারণ সৈনিক বা স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নানা মাত্রায় দেশপ্রেমের মিশেল থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু তারা প্রাপ্তবয়স্ক বলে তাদের জীবনবাজি রাখার সিদ্ধান্তকে সমীহ করা হয় এবং গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক

BanglaBook.org

হওয়ার আগেই কারও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কথা মেনে নিতে পারে না স্বাভাবিক চিন্তা ও বোধসম্পন্ন একজন মানুষ। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা কিশোররা যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ নেবে এবং ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হবে একথা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ যে যোদ্ধা হবে তার তো বুদ্ধি-বিচার এবং শরীরের গঠন সবই পরিণত ও উপযুক্ত হতে হবে যুদ্ধের জন্য। তাহলে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা বালিকা কীভাবে অংশ নিতে পারে যুদ্ধের মত কঠিন কাজে? যে কাজে হাতে অস্ত্র ধারণ করা হয় রক্তপাত ও হত্যার উদ্দেশ্যে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হলেও যুদ্ধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু নিয়ম-নীতি আছে। যুদ্ধের কারণকে গুরুত্ব দিয়েও মানুষের প্রাণ, সম্মান ও সম্পদের প্রতি সম্মান দেখানোর নিয়ম। আছে যুদ্ধাহত শত্রুসৈন্য ও যুদ্ধবন্দির প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা হবে, বেসামরিক জনগণ ও সম্পদের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা হবে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও রুগ্ণদের প্রতি কী প্রকার ব্যবহার করা হবে ইত্যাকার বিবিধ বিষয়ে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করা কিছু নিয়ম। যুদ্ধ তো ছেলেখেলা হতে পারে না। হত্যা ও রক্তপাত তো অবুঝ-উল্লাসের বিষয় হতে পারে না। তাই সভ্য মানুষের হিসেবের খাতায় চাইল্ড সোলজার বা শিশু সৈনিক বলে কোনো কথাও থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমান সংঘাতময় পৃথিবীতে বাস্তবতা অনেক বেশি নির্মম।

যুদ্ধ তো বড়দের কাজ, অপ্রাপ্তবয়স্কদের নয়

হ্যাঁ বড়রাই যুদ্ধ করেছে এবং করবে কিন্তু এর ভেতরে অপ্রাপ্তবয়স্করা কেন আসবে? অথবা কেউ কেন তাদের বাধ্য করবে যুদ্ধে শামিল হতে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে! যুদ্ধে বড়রা যেমন হারায় তেমনি ছোটরাও হারায় তাদের জীবন, শরীরের অঙ্গ, জীবনের স্বস্তি ও সুখ। তারা তাদের সর্বস্ব হারাতে পারে যুদ্ধের কারণে। কিন্তু সবচেয়ে অন্যায়ভাবে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যুদ্ধে যা হারায় তা হল তার শৈশব ও কৈশোর। একজন মানুষ তার শৈশব হারাবে বা তার কৈশোর হারাবে বরং বলা ভালো তার বাল্যকালের স্বপ্ন-সুখের দিনগুলো অযথা হয়ে উঠবে বিষাদময়, তা মেনে নেয়া যায় না। এটা নিঃসন্দেহে মানবতার প্রতি অবিচার। সুস্পষ্টভাবে এটি সভ্য মানবসমাজের পরিমণ্ডলে একটি অসভ্য ও অমানবিক কাজ।

বলা যায় বিশ্বের শতকরা একশ ভাগ সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এ কথাগুলোর সাথে একমত হবে। অথচ তার পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি চাইল্ড সোলজার নামে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। এই সুন্দর পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতময় স্থানকে ঘিরে এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আন্দাজ করা

BanglaBook.org

হয়ে থাকে বর্তমান বিশ্বের ৩০টির বেশি সংঘাতময় স্থানে তিন লক্ষেরও বেশি চাইল্ড সোলজার সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ ও হানাহানিতে জড়িত হয়ে আছে। কোনো দেশে সরকারের সাথে সংঘর্ষ চলছে এক বা একাধিক বিদ্রোহী বাহিনীর। আবার কোথাও গৃহযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছে দেশের বেসামরিক জনগণ। কোথাও আবার স্বাধীনতাকামীদের সংগ্রাম চলছে বহিরাগত শক্তির বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের। যে নামেই হোক না কেন সংঘর্ষ সংঘর্ষই। সংঘর্ষ চলছে দুই বা ততোধিক সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে। একপক্ষে সরকারি বাহিনী অন্যপক্ষে এক বা একাধিক বিদ্রোহী বাহিনী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, সরকারি সৈন্যদের একটি দল যোগ দিয়েছে বিদ্রোহীদের সাথে, আবার বিদ্রোহীদের একটি দল আশ্রয় পেয়েছে সরকারি বাহিনীর। তাদের বিভেদ ও মতপার্থক্যের কারণে নানাভাবে ও বিভিন্ন জটিল ধারায় সংঘর্ষ হয়েছে দলগুলোর মধ্যে। অথচ জনগণের পক্ষে বুঝে নেয়া কষ্টকর হয়েছে কারা সরকারি দলের আর কারা বিদ্রোহী দলের। অর্থাৎ কারা জনগণের পক্ষে দাবি আদায়কারী ও জনগণের আশ্রয়দাতা আর কারা জীবন ও বসতি ধ্বংসকারী গণশত্রু। চরম বিভ্রান্তির মাঝখানে পড়ে বারবার ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে জনগণকেই। এ ধরনের একটি দলকে সিয়েরা লিয়নের জনগণ বাধ্য হয়ে নাম দিয়েছিল 'সোবেল' (Sobel)। এটি হল Soldier এবং Rebel এ দুটি শব্দের সংযুক্তির ফলাফল। এই দলে সরকারি সৈন্য ও প্রাক্তন বিদ্রোহী উভয়েই ছিল। এরা দিনের বেলা সরকারি ইউনিফর্ম পরে কাজ করেছে আর রাত্রিবেলায় বিদ্রোহীদের মত নিরীহ জনগণকে আক্রমণ করে লুটতরাজ করেছে যথেচ্ছভাবে। নিরাপত্তাহীনতার এমন তিক্ত অভিজ্ঞতাও কোনো কোনো দেশের জনগণকে অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু এমন অবিমিশ্র নীতিহীনতা ও মাৎস্যন্যায় অবস্থার মধ্যে যদি অপরিণত বয়সের মানবসন্তানরা এসে যুক্ত হয় তাদের অপরিণত বিচারবোধ ও অবুঝ-আবেগ নিয়ে তাহলে কতই না জঘন্য হয়ে যেতে পারে সেই সংঘর্ষের পরিস্থিতি। তাই অবস্থা যেমনই হোক না কেন অপ্রাপ্তবয়স্কদের যুদ্ধে জড়িত হওয়ার পক্ষে একটি সঙ্গত কারণও খুঁজে বের করা যায় না।

যুদ্ধে জড়ানোর পরিস্থিতি

প্রশ্ন করা যেতে পারে, কারা যায় এই জীবন-মরণ খেলায় শিশু সৈনিক বা চাইল্ড সোলজার হিসেবে যোগ দিতে? এক কথায় বলা যায়, এরা কিছু দুর্ভাগা শিশু ও কিশোর, পরিস্থিতির শিকার হয়ে যারা তাদের অবিদ্যঘন শৈশব-কৈশোর হারিয়ে বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই পরিণত হয়েছে যুদ্ধের খোরাকে। দেখা যায়, নানাবিধ কারণেই গতকালের নিষ্পাপ শিশু আজ পরিণত হয়েছে এক নিষ্ঠুর হন্তারকে বা

BanglaBook.org

শিশুযোদ্ধায়। যারা একবার এই দুষ্টগ্রহের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে তারা আর কখনও তা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি নিরাপদে, ফিরে আসতে পারেনি জীবনের স্বাভাবিকতায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের যুদ্ধে জড়ানোর অনিবার্য পরিস্থিতিগুলোর বর্ণনা এভাবে দেয়া যায়—

১. যখন যুদ্ধ লাগে, তা গৃহযুদ্ধ হোক বা দুই বাহিনীতে কোনো সংঘর্ষ, তখন অনেকগুলো সংসার পিতা-মাতা হারিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। অসহায় হয়ে পড়ে ঐ পরিবারের শিশু-কিশোরেরা। এদের দেখাশোনা করা এবং আশ্রয় দেয়ার তখন কেউ থাকে না। বিদ্রোহী বা সরকারি বাহিনী এদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং পরিণত করে চাইল্ড সোলজারে।

২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু জেদী কিশোর দেখে ফেলে কত নির্মমভাবে তাদের পিতা-মাতা বা আপনজনকে হত্যা করা হয়েছে তাদের চোখের সামনে। তখন তারা মরিয়া হয়ে ওঠে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং হত্যাকারীদের বিপক্ষ দলে যোগ দেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। পরবর্তীতে একবার যখন অস্ত্র হাতে পায় তখন কোন প্রকার নিয়মনীতির ধার ধারে না তারা। সর্বশক্তি দিয়ে শুধু প্রতিশোধ গ্রহণে মেতে ওঠে। তাদের হাতে ঘটে যাওয়া যে কোনো রক্তাক্ত তাণ্ডব ও নিষ্ঠুরতাকে তাদের লক্ষ্য পরিপূরণের কার্যকারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় শুধু। প্রতিশোধ গ্রহণ ও পাশবিক উল্লাসের জন্য ঘটানো এসব হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের ভিন্ন কোনো যৌক্তিকতা নেই।

৩. যখন কোথাও যুদ্ধ বা সংঘর্ষ চলে সেখানকার স্বাভাবিক জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়া-লেখা সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে ভবঘুরে জীবনে সমর্পিত হয় অনেকে। কোনো কোনো কিশোর তরুণ তখন নিছক থ্রিল বা রোমাঞ্চকর কাজ করার জন্য অস্ত্র হাতে নিতে ছুটে যায় এবং পরিণত হয় চাইল্ড সোলজারে।

৪. অনেকে ক্ষুধার তাগিদে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকারি বা বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগ দেয় স্বেচ্ছায়। এই 'স্বেচ্ছায়' অবস্থাটা যে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা মাত্র সেটা বুঝে নিতে কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কারণ ওরা জানে অস্ত্র হাতে নিয়ে যে কোনো বাহিনীতে যোগ দিলে তারা নিশ্চিতভাবে প্রতিদিনের খাবার এবং থাকার আশ্রয় পাবে। যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মানুষের এই অসহায় অবস্থাকে সরকারি বা বিদ্রোহী বাহিনীগুলো ব্যাখ্যা করে 'স্বেচ্ছায় যোগদান' হিসেবে।

৫. শুধু তা নয়, এ সকল অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো শিশু-কিশোর যখন দেখতে পায় যে বয়স্ক লোকেরাও অবলীলায় তাদের কথা মেনে নিচ্ছে, অস্ত্রের ভয়ে তাদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করছে তখন তা একটা বিরাট মোহ হয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়ায় একজন অবুঝ বালক-বালিকার কাছে। তারা যখন দেখে যে অস্ত্র হাতে সামান্য কিছু নিষ্ঠুরতা দেখালেই সমাজের সকলেই তাদের আদেশের অধীন হয়ে যায়, তখন তারা আরও বেশি এগিয়ে যায় নিষ্ঠুরতার দিকে।

৬. কোনো কোনো শিশু-কিশোর শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের সহগামী ও সহযাত্রী হয়ে দেশ বা জাতির জন্য জীবন দিতে এগিয়ে যায়—হাতে তুলে নেয় অস্ত্র আর কোমরে বেঁধে নেয় বোমা। জীবনের কোনো ব্যাপারেই যাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার বয়স হয়নি নীতি-আদর্শ বা ধর্মীয় ও জাতিগত প্রেরণার নামে তাদেরকেই জীবন-মরণ খেলায় ঠেলে দেবে প্রাপ্তবয়স্করা—এ কাজ নিঃসন্দেহে অমানবিক।

চাইল্ড সোলজার হওয়ার আরও কিছু অনিবার্যতা

যে কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষে জীবনের ক্ষয় হয় প্রচুর পরিমাণে। আহত বা নিহত হয় প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম লোকগুলো, যারা সরাসরি সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এক পর্যায়ে দেখা যায় বাহিনীগুলোতে সৈনিকের বা যোদ্ধার সংখ্যায় টান পড়েছে। নতুন সৈনিক বা যোদ্ধা সংগ্রহ করার উপায়ও সীমিত হয়ে পড়ে। কারণ যথেষ্ট সংখ্যক সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ লোকালয়গুলোতে আর অবশিষ্ট থাকে না। কেউ মারা গেছে আর কেউ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এমন ক্ষেত্রে কোনো কোনো সরকার নাগরিকদের উপর সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে এবং আইনের জোরে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের শামিল করে নেয়। কিন্তু বিদ্রোহী বা যুদ্ধরত অন্য দলগুলোর সেই সুযোগও থাকে না। অথচ পরিস্থিতির তাগিদ এমনই যে লক্ষ্য অর্জনই শুধু নয় অস্তিত্বের প্রয়োজনে তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের যোগান দেয়ার জন্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তো আছেই কিন্তু সেই অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করার জন্য যোদ্ধার হাত কোথায় পাওয়া যাবে! তাই তাদেরকে নির্দয়ভাবে এগিয়ে যেতে হয় আপন গোত্র ও স্বদেশীয় জনগণের দিকে। যেভাবেই হোক না কেন তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই তারা আপন জনপদে গিয়ে 'জনগণের সাহায্য-সমর্থন' হিসেবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আর যেসব গোত্র বা জনপদে এ ধরনের সমর্থন মেলে না সেখানে ভয়-ভীতির সৃষ্টি করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জোর করে তুলে নিয়ে আসা হয়। ওইসব জনপদে গিয়ে তারা কাউকে হত্যা করে, কাউকে বিকলাঙ্গ করে, নারীদের নির্যাতন করে, জ্বালাও পোড়াও এবং লুটতরাজের মাধ্যমে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড ভীতিকর এক পরিস্থিতির যাতে কেউ তাদের বিপক্ষে না যায় বরং তাদের পক্ষে তথ্য ও সহযোগিতা দিয়ে এবং সৈনিক হিসেবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাহায্য-সহযোগিতা করে। কিছু কিছু চিত্র এরকম

BanglaBook.org

১. পরিস্থিতির চাপে পড়ে নিজের মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের বাঁচানোর জন্য অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ককে 'স্বেচ্ছায়' অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়। বাধ্য হয়েই এসব উঠতি বয়সের কিশোর-তরুণেরা সংঘাত ও রক্তপাতের সাথে জড়িয়ে নেয় নিজেদের জীবনকে।

২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত দলগুলো স্কুল, এতিমখানা বা রাস্তাঘাট থেকে কিশোর-তরুণদের জোর করে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ভয়-ভীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে বাধ্য করা হয় ট্রেনিং নিতে ও দলে যোগ দিতে।

৩. যুদ্ধের কারণে নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদের মধ্য থেকে অনুপ্রেরণা, প্ররোচনা বা ভয়-ভীতির মাধ্যমে রিক্রুট করা হয় উঠতি বয়সের কিশোর-তরুণদের। শরণার্থী বা উদ্বাস্তু শিবিরের অনিশ্চিত ও কঠিন জীবনের বদলে তাদের অনেকে সাগ্রহে বেছে নেয় যোদ্ধার জীবন।

৪. ইদানীংকালে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে অস্ত্রগুলো হয়ে পড়েছে অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় অথচ হালকা। এদের দৈর্ঘ্য এমন যে পুরোপুরি না বেড়ে ওঠা বালক-বালিকারাও এগুলো সহজে বহন ও ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং একজন অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্যও হাতে অস্ত্র নিয়ে যোদ্ধা হয়ে যেতে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

৫. যুদ্ধ যত বেশি দিন চলতে থাকে তত বেশি সক্ষম পুরুষ হতাহত হয়। ফলে যুদ্ধরত দলগুলো ঝুঁকে পড়ে শিশু-কিশোর ও মহিলাদের প্রতি। ফলে আরও বেশি অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-তরুণেরা এমনকি শিশুরাও বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে মেতে ওঠে যুদ্ধের হিংসাত্মক খেলায়।

৬. যখন একটি দল আরেকটি দলকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাদের বসতবাড়ি ধ্বংস করে, আপনজনদের হত্যা করে, নিগৃহীতভাবে উদ্বাস্তু জীবনযাপনে বাধ্য করে তখন সেই দলভুক্ত পরিবারগুলোও কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নেয় এবং ধর্মীয় উদ্দীপনা বা গোত্রগত সম্মান রক্ষার জন্য হোক অথবা অন্য কোনো দীক্ষা-প্রেষণায় উদ্দীপিত হয়ে হোক নিজের পরিবারের সন্তানদের উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং অত্যন্ত মর্যাদাবোধের সাথেই হাতে তুলে দেয় মারাত্মক অস্ত্র বা জীবনঘাতী বোমা। তা হতে পারে ফিলিস্তিনের মুসলমান, শ্রীলঙ্কার তামিল হিন্দু বা বেলফাস্টের খ্রিস্টান পরিবারে। এভাবেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিশ্বের দেশে দেশে তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার চাইল্ড সোলজার।

BanglaBook.org

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু-কিশোরদের বেশি সংখ্যায় সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে সংগঠিত করার পেছনে কিছু আকর্ষণীয় কারণও আছে। যেমন :

১. এদেরকে কোনো বেতনই দিতে হয় না, শুধু অস্ত্র হাতে দিলেই হয়। ওরাই সেই অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিজেদের খাবার, কাপড়, জুতা-জামা ইত্যাদি অনায়াসে সংগ্রহ করে নিতে পারে নিরীহ জনগণের নিকট থেকে। সরকারি বাহিনীগুলোতে চাইল্ড সোলজারদের বেতন দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও তার পরিমাণ হয় অত্যন্ত নগণ্য।

২. অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু-কিশোরদেরকে বড়রা খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারে বলেই তারা হয়ে যায় বিনা-প্রতিবাদের আজ্ঞাবাহক। বয়স্ক সৈনিকরা তাদের অধীনে এ ধরনের আজ্ঞাবহ কাউকে পেলেই বরং খুশি হয়।

৩. কাজের ধারা বা ধরন যেমনই হোক না কেন চাইল্ড সোলজাররা তার প্রতিবাদ করতে পারে না। তারা আদেশ অস্বীকার করতে অথবা কাজ থেকে পিছিয়ে আসতে সম্পূর্ণ অপারগ থাকে, তা ভয়ে হোক অথবা অন্য কোনো স্বভাবগত কারণে।

৪. প্রাপ্তবয়স্ক অফিসাররা চাইল্ড সোলজারদের খুব সহজেই নিজের আজ্ঞাবহ ও অনুসারী করে নিতে পারে। তাদের প্রয়োজন নিঃশঙ্কচিত্ত কিছু অনুসারীর। এতে তাদের দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে বাহবা কুড়ানোর সুযোগ থাকে।

৫. প্রাপ্তবয়স্ক সৈনিকদের মত চাইল্ড সোলজারদের কোনো সামাজিক ঝুট ঝামেলা নেই। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সৈনিক তার স্ত্রী, সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে এবং তাদের কাছে তাকে বারবার ফিরে যেতে হয়। কিন্তু নিজের পিতা-মাতার সাথে একবার সম্পর্কচ্যুতি হয়ে গেলে (তাদের নিহত হওয়া অথবা স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে) চাইল্ড সোলজারদের আর কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। শুধু তা নয় উগান্ডার উত্তরাঞ্চলে লর্ডস রেজিসট্যান্স আর্মি নামের বিদ্রোহীদের একটি খ্রিস্টান-মৌলবাদী দল শিশু-কিশোরদেরকে ধরে নিয়ে বাধ্য করে তাদের নিজ গ্রাম বা নিজ পরিবারের মধ্যে নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ড ঘটায় যাতে তারা আর কখনও ঐ বাহিনী ত্যাগ করে নিজে পরিবার বা গ্রামে ফিরে আসতে না পারে এবং গ্রামবাসীর মনেও তার সম্পর্কে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ফলে তাকে এলআরএতেই থেকে যেতে হয়।

৬. সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কারণে শিশু-কিশোররা অকালে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার হুমকির সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে বিশেষ কোনো গোত্র, বর্ণ বা ধর্মীয় দলের অথবা কোনো সংঘর্ষপীড়িত এলাকার বালক-বালিকারা গোত্রগত দ্বন্দ্ব ও গোত্রের মান রক্ষার প্রতিযোগিতা হিসেবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

চাইল্ড সোলজার হয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের কথা বাদ দিলেও, এই ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষগুলোতে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই হাজার হাজার শিশু-কিশোর অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত দু'দশকের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে পেরুর 'দি শাইনিং পাথ' গেরিলাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ। কেউ কি খবর রাখে এর মধ্যে কতজন ছিল শিশু-কিশোর, যারা জীবনকে বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ হারাল অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হল বড়দের সৃষ্ট সংঘর্ষে?

উদ্বাস্তু থেকে চাইল্ড সোলজার

কোনো দেশে বা অঞ্চলে যখন সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় তখন স্থানীয় জনগণ নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পরিণত হয় উদ্বাস্তুতে। তারা তাদের সাজানো সংসার, ক্ষেত-খামার, জমি-জিরাত সবকিছু ফেলে শূন্য হাতে অথবা ছোটখাটো পুঁটলিতে করে যা নেয়া যায় তা নিয়েই পাড়ি জমায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এই আশ্রয় হতে পারে নিজ দেশের অন্য কোনো অঞ্চলে অথবা অন্য কোনো দেশে। সেখানে তাদের থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত আগে থেকে থাকার কথা নয়। যেভাবেই হোক না কেন বাঁচার তাগিদে এইসব ব্যবস্থা তাদের করে নিতে হয়। সাধারণত সীমিত সম্পদ নিয়ে সেখানকার স্থানীয়রা অথবা আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো এগিয়ে আসে বটে কিন্তু তবু উদ্বাস্তু শিবিরের জীবন হয় অত্যন্ত কঠিন ও হতাশাপূর্ণ। এই হতাশা ও জীবনের উপর বিতৃষ্ণা থেকে বাঁচার জন্যই যুবক-তরুণ-কিশোর এমনকি শিশুরাও সম্পৃক্ত হয়ে যায় সশস্ত্র সংঘর্ষে। জন্ম হয় অসংখ্য চাইল্ড সোলজারের। স্বভাবগত কারণে যদি কেউ চাইল্ড সোলজার হতে ভয় পায় তাহলে অন্যদের চাপে পড়ে সেও বাধ্য হয় অস্ত্র হাতে নিয়ে জীবন-মরণের খেলায় মেতে উঠতে। অন্যদিকে যুদ্ধ বা সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় হতাহত হওয়ার কারণে অথবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে অনেক পরিবার হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন। আর এই সকল অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তানরাই হয়ে ওঠে একেকজন চাইল্ড সোলজার।

উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে ধনী পরিবারগুলোর ব্যাপারটা একটু ভিন্ন ধরনেরই হয়ে থাকে। কারণ ধনী পরিবারগুলো নিজেদের সন্তানদের আগেভাগেই নিজ দেশের নিরাপদ কোনো স্থানে অথবা অন্য কোনো নিরাপদ দেশে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের লেখাপড়া ও জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে লেবানন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে যে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য বালকদের শুধু নয় সক্ষম পুরুষদেরকেও অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কী

BanglaBook.org

হয় দরিদ্র পরিবারের অশিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে? সামর্থ্যহীনতার জন্য এবং অভিভাবকহীনতার কারণে তারা চাইল্ড সোলজার হিসেবে যুদ্ধের খোরাকেই পরিণত হয় শুধু।

এ ছাড়াও আপন গোত্রের যুদ্ধরত দলগুলোকে সশস্ত্র যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করার জন্য এক ধরনের গোত্রগত বাধ্যবাধকতা থাকে প্রায় সকল গোত্রভুক্তদের মধ্যে। যার ফলে এই সকল পরিবার সংঘাতপূর্ণ এলাকা ছেড়ে অনেক দূরের নিরাপদ স্থানে চলে গেলেও তাদের মধ্য থেকে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ হয় না কখনও। যেমন, তুরস্কের কুর্দিদের বিদ্রোহী গ্রুপ পিকেকে তাদের নিজেদের জন্য নিজেদেরই কুর্দি গোত্রের ছেলে-মেয়েদের রিক্রুট করেছে সুদূর সুইডেন, জার্মানি এবং ফ্রান্স থেকে। এভাবে দেখা যায় যে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে চাইল্ড সোলজারের সংখ্যাও বেড়ে যায় আশঙ্কাজনকভাবে। অন্যদিকে আবার দেখা যায় চাইল্ড সোলজার হওয়ার জোর-জবরদস্তি এড়ানোর জন্য লোকজন নিজেদের স্থায়ী বাড়িঘর ছেড়ে দেশের ভিতরেই ভবঘুরে উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। কলম্বিয়াতে দেখা গেছে শুধু জবরদস্তিমূলক রিক্রুটমেন্ট এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে নিজ দেশেই। তাই যখন সংঘর্ষ চলে তখন রিক্রুটমেন্টের ঝুঁকি থেকে যায় বলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক উদ্বাস্তুদের চাইল্ড সোলজারে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সকলেরই বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

শুধু তাই নয়, যুদ্ধহীন অনেক দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই সরকারি সেনাবাহিনীতে অপ্রাপ্ত বয়সে রিক্রুটমেন্ট হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকে উদ্বাস্তুর জীবন বেছে নেয়। যেমন যুক্তরাজ্যে আইনের বাধ্যবাধকতায় ১৬-১৭ বছর বয়সেই ব্রিটিশ নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়। অথচ দেখা যায় প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০০ জন ১৮ বছরের কম বয়স্ক সৈনিক সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাচ্ছে (ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত বা অন্য কোনোভাবে)। দেখা গেছে পরে এরা আশ্রয়ের জন্য হোমলেস হোস্টেলে ধরনা দিচ্ছে এবং উদ্বাস্তুর জীবন বেছে নিচ্ছে।

যেভাবে জীবন কাটে

প্রাক্তন চাইল্ড সোলজারদের দেয়া বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তাদের চলমান জীবনযাত্রা হয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও হৃদয় বিদারক। যে সকল চাইল্ড সোলজার সরকারি বাহিনীর অংশ হিসেবে কাজ করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক সৈনিকদের মতই ব্যবহার করা হয়। অথচ এদের মধ্যে কারও কারও বয়স দশ বা সাত বছরও ছিল। এদের প্রতি অত্যন্ত অমানবিক ব্যবহার করা হয়। যেমন :

BanglaBook.org

১. সরকারি সৈনিকরা চেষ্টা করে শুরু থেকেই এদের প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে এবং তাদের মনে এক প্রকার ভীতির স্থায়ী ভিত রচনা করতে। তাই তারা তাদের সাথে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে। শিশুমনের উপর এর প্রভাব হয় ক্ষতিকরভাবে নানামুখী।

২. ক্যাম্পের কঠিন জীবনের সাথে মানিয়ে চলতে বাধ্য করার জন্য শিশু-কিশোরদের দেয়া হয় অত্যন্ত নির্মম পন্থায় কঠোর শাস্তি, যাতে একজনকে দেয়া শাস্তির মাত্রা দেখে অন্যরাও ভয় পায়। এইসব নির্মমতার ফলে কোনো কোনো সময় অনেক চাইল্ড সোলজার মৃত্যুবরণ করে অথবা আত্মহত্যা করে। অনেকেই শারীরিক ও মানসিক আঘাত নিয়ে দুঃসহভাবে বেঁচে থাকে।

৩. শারীরিক ও মৌখিকভাবে কড়া ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে মানুষ হত্যা করাটা তাদের জন্য অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, বিভিন্ন পশুর গলা কেটে তার রক্ত পান করার প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেয়া হয়ে থাকে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের চাইল্ড সোলজারদের ইতিহাস ঘাঁটলে এর অসংখ্য নজির পাওয়া যায়।

৪. তাদেরকে থাকতে দেয়া হয় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। তাছাড়াও মাদকদ্রব্য ও পতিতাদের ব্যবহার করে পরিবেশকে সম্পূর্ণ দূষিত করে রাখা হয়। এ ধরনের পরিবেশ প্রাপ্তবয়স্ক সৈনিকদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তা অত্যন্ত অসহনীয় ও কঠিন।

৫. কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাইল্ড সোলজারদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয় এবং তাদের সেনা পর্যায়ের নিম্নতম পদবিতে নিয়োগ করা হয়। ফলে তাদের চিকিৎসা ও খাবারের মান হয় অত্যন্ত নিচু। অথচ একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার শারীরিক গঠনের জন্যও এই অবস্থা যথার্থ নয়।

৬. অন্যদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহী দলগুলোতে চাইল্ড সোলজারদের অবস্থা হয় আরও খারাপ। যেসব চাইল্ড সোলজার সেখানে তাদের মানিয়ে নিতে পারে না তাদেরকে 'খামোশ' করে দেয়ার অত্যন্ত সহজ পন্থা হল হত্যা করা।

৭. সেখানে চাইল্ড সোলজারদের হত্যাকারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মাংস কেটে ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হয়। এমনকি এ ধরনের নির্মম কাজ করানো হয় একই পরিবারের লোকদেরকে দিয়েও। রুয়ান্ডার হুতু ও তুতসি এই দুই বৃহৎ গোত্রের দলের এ ধরনের নির্মমতার অনেক ঘটনা ঘটেছে। যেমন, গুলির মুখে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন অর্থাৎ একই পরিবারের একজনকে বাধ্য করা হয়েছে অন্যজনকে হত্যা করতে এবং অনেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য তা করেছে।

BanglaBook.org

৮. অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আদিম-ধারার অনেক গোত্রের মধ্যে আজও এ ধারণা প্রচলিত আছে যে যদি কেউ তার শত্রুর কলিজা তাজা খেতে পারে তাহলে তার নিজের কলিজা হবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাকে কেউ হত্যা করতে পারবে না অর্থাৎ সে হবে মৃত্যুঞ্জয়ী। হয়তো এজন্যই আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে তার জাহেলী বিশ্বাস প্ররোচিত করেছিল হযরত হামযার (রা.) কাঁচা কলিজা চিবিয়ে খেতে। বর্তমান যুগেও দেখা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে আফ্রিকার অনেক গোত্রের লোকেরা তাদের শত্রুদের হত্যা করার পর অথবা জীবিত অবস্থায় তার বুক চিরে কলিজা বের করে আনছে এবং তা নিজেরা চিবিয়ে খাচ্ছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক চাইল্ড সোলজারদের এ ধরনের নির্মম কাজ করার জন্য বেশি পরিমাণে বাধ্য করা হয়।

৯. সরকারি বাহিনীগুলোর মত বিদ্রোহী দলগুলোতেও চাইল্ড সোলজারদের মাদকদ্রব্য সেবন করানো হয় ও যৌন অবিচারের শিকার করা হয়। মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক হিতাহিত জ্ঞানকে নষ্ট করে দিয়ে তাদের নৈতিকতাবিরোধী ও যুদ্ধের ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতে ব্যবহার করা হয়। যেমন, মাইন ফিল্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে স্কাউট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের প্রথমেই তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয় এবং ব্যাপকভাবে আত্মঘাতী মিশনে নিয়োজিত করা হয়। নিরীহ জনগণকে হত্যা বা হাত-পা কেটে দিয়ে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার জন্য বা সম্পদ ধ্বংস করার জন্য শিশু-কিশোরদের অধিক হারে ব্যবহার করা হয়।

১০. যখন মুখোমুখি শত্রুর সাথে পরিপূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয় তখন অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও ধৈর্যের অভাবের কারণে চাইল্ড সোলজাররা ব্যাপকভাবে হতাহত হয়ে থাকে।

১১. যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বেড়ে গেলে আহত চাইল্ড সোলজারদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে চলে আসার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকি তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে আহত চাইল্ড সোলজারকে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে যাওয়া হয়।

১২. যখন বিপক্ষ দল চাইল্ড সোলজারদের বন্দি করে তখন ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে তাদের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের মতই কঠোর ব্যবহার করা হয় এবং তাদেরকে সন্ত্রাসী বা দুষ্কৃতিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা কিশোর হিসেবে নরম ব্যবহার তাদের সাথে করা হয় না বরং এদের জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি হয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বর্বর। কখনওই এরা শারীরিক নির্যাতন থেকে এবং মেয়েরা ধর্ষণ থেকে রক্ষা পায় না।

BanglaBook.org

১৩. কোনো কোনো সরকারি বা বিদ্রোহী দল বন্দি চাইল্ড সোলজারদের পুনরায় নিজেরা ব্যবহার করার জন্য ট্রেনিং দিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই ছেলে বা মেয়ে চাইল্ড সোলজারদের গোয়েন্দা কাজে ব্যবহার করা হয় অথচ এই গোয়েন্দারা একবার বিপক্ষদলের হাতে ধরা পড়লে পরিণত হয় বর্বর অত্যাচার ও যন্ত্রণাদায়ক হত্যার শিকারে।

বিভিন্ন যুদ্ধে পক্ষে-বিপক্ষে চাইল্ড সোলজারদের অংশগ্রহণের বিষময় ফল হয়েছে এই যে এখন বন্দিদের মধ্যে শিশু-কিশোরদেরকেও সামান্য সন্দেহভাজন হলেই অত্যন্ত কড়া শাস্তি ও হৃদয়হীন জিজ্ঞাসাবাদের শিকার হতে হয়। আজকাল তো অপ্রাপ্তবয়স্ক সৈনিকদের বন্দিত্বের বিষয়ে কোনো প্রকার খবর বা ব্যাখ্যাই তাদের পরিবার বা তাদের পক্ষের কাউকে দেয়া হয় না। অথচ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশন (আর্টিকেল ৩৭ ও ৪০) অনুযায়ী শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

মেয়েরা যখন চাইল্ড সোলজার

ছেলেদের সাথে মেয়েরাও একই প্রক্রিয়ায় ও পদ্ধতিতে চাইল্ড সোলজারে রূপান্তরিত হয়। কেউ পরিস্থিতির কারণে স্বেচ্ছায় যায় আর কাউকে অপহরণ করার পর এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এদের কারও হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়, কাউকে গোয়েন্দা কাজে ব্যবহার করা হয়, আবার কাউকে কমান্ডারদের ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো মেয়েকে আবার সার্বজনীনভাবে ক্যাম্পের সকল লোকের সকল রকম প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ক্যাম্পে অবস্থান করে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সকল প্রকার কায়িক শ্রম তাদের করতে হয়। কোনো কোনো মেয়েকে যুদ্ধের অপারেশনেও নিয়ে যাওয়া হয়। পালিয়ে যাওয়া বা বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে যেহেতু মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল এবং নিজেদের আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ তাই তারা সকল প্রকার যৌন অসদাচরণের শিকার হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহিনীর স্বার্থে তাদেরকে গোয়েন্দা কার্যের পন্থা হিসেবে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। নিতান্ত অসহায়ত্বের কারণেই মেয়েরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এমনকি যুদ্ধের পর শান্তি -প্রক্রিয়া চলাকালেও এনজিও কর্মকর্তা-কর্মী এবং স্থানীয় বা বিদেশি সংগঠক পুরুষদের অসদাচরণের শিকার হয়।

যুদ্ধের পর বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে যে এইসব দুর্ভাগা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার শরীর ও মনের উপর সকল প্রকার অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত মারাত্মক। শুধু তাই নয় এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে তাদের পরিবার বা সমাজের উপরেও। ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য মেয়ে মানসিক বৈকল্যের শিকার হয়। শারীরিকভাবে

BanglaBook.org

নানা দুরারোগ্য যৌনরোগ ছাড়াও নানা প্রকার শারীরিক অসামর্থ্যেরও শিকার হয়ে পড়ে তারা। এমনকি বারবার গর্ভপাতের পরেও অবৈধ গর্ভধারণের ফল হয় অত্যন্ত মারাত্মক। অন্যদিকে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে কোনো কোনো পরিবার ও সমাজ এসব মেয়েকে গ্রহণ করতে চায় না। আশ্রয়ের অভাবে তাদের বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কোনো পরিবার ও সমাজ তাদেরকে গ্রহণ করে নিলেও আর্থিক অসমর্থতার কারণে তাদের মানসিক বা শারীরিক চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অতটুকুন ছোট্ট শরীরে বাসা বেঁধে থাকা দুরারোগ্য যৌনব্যাধির অসহনীয় প্রভাব তো আছেই। এদের দুর্দশা দেখে মানসিক বৈকল্যের সৃষ্টি হয় তাদের পিতা-মাতা বা ভাই-বোনদের মধ্যেও। বিশেষত পরিবারের পুরুষ সদস্যরা অক্ষমতার যন্ত্রণাদায়ক অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়ে। এতে অনেকের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও চিন্তাভাবনা ভণ্ডুল হয়ে যায়। যেমন কোনো পিতা মারাত্মকভাবে মদ্যপ হয়ে ওঠে বা কোনো ভাই প্রচণ্ড দুঃখবাদী অথবা বাউণ্ডুলে হয়ে যায়। পিতৃহীন সন্তান নিয়ে কোনো কোনো মেয়ে ও তার পরিবারকে দুঃসহ সামাজিক জীবনযাপন করতে হয়।

কেস স্টাডি : মিয়ানমার

বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দেশটি গণতন্ত্রের মুখ খুব একটা দেখতে পায়নি। জাতি ও গোত্রগত দ্বন্দ্ব এখানে লেগেই আছে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এক সময় সেদেশে সরকারবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহী দলের সংখ্যা ছিল মোট ১৯টি। ইদানীং কেউ কেউ সরকারের সাথে শান্তিচুক্তিতে বসেছে বলে বলা হয়। এরা প্রত্যেকেই গোত্রগত অধিকার অথবা স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করছে। ফলে সেদেশে গণতন্ত্র নয় বরং সামরিক শাসনকেই দ্বন্দ্ব-বিভেদ ভুলে থাকার মহৌষধ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে বহুমুখী শত্রুর মুখোমুখি হতে গিয়ে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ধারণ করেছে বিশাল আকার।

সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর রিক্রুটমেন্ট হয় সাধারণত নিজ নিজ গোত্রের নারী-পুরুষদের মধ্য থেকে। বলে রাখা ভালো যে, ছোট হলেও এই দেশটি অনেকগুলো জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। বহুদিন ধরে পৃথক পৃথকভাবে অনেকগুলো বিদ্রোহী দল মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। তাই বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে সক্ষম যোদ্ধার সংখ্যাস্বল্পতার কারণেই তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সশস্ত্র সংঘর্ষে ব্যবহারের জন্য রিক্রুট করে থাকে—তা স্বেচ্ছামূলক বা

BanglaBook.org

বাধ্যতামূলক যেভাবেই হোক না কেন। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দল হল 'দ্য ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড স্টেট আর্মি'। এই বাহিনীতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চাইল্ড সোলজার বর্তমানে নিয়োজিত বলে জানা যায়। 'দ্য কাছিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি' নামের দলটিও জোরপূর্বক চাইল্ড সোলজারদের রিক্রুট করে থাকে বলে জানা যায়। এ দলটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও রিক্রুট করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও 'সান স্টেট আর্মি (দক্ষিণ)', 'কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' এবং 'দ্য কারেন্নি আর্মি' অপ্রাপ্তবয়স্কদের রিক্রুট করার বিরুদ্ধে নীতিমালা গ্রহণ করেছে বলে দাবি করে থাকে তবু অপ্রাপ্তবযস্করা স্বেচ্ছায় যোগ দিতে চাইলে তাদেরকে তারা গ্রহণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে মিয়ানমারের সরকারি সৈন্যসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর সেনাবাহিনীগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তাদের মোট সৈন্য-সংখ্যার শতকরা বিশ ভাগের বেশির বয়স আঠার বছরের কম। অপ্রাপ্তবয়স্কদের রিক্রুট করার ব্যাপারে মিয়ানমার সেনাবাহিনী জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারি সৈন্যরা প্রায়ই ট্রেন বা বাস স্টেশন, বাজার ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে উঠতি বয়সের বালকদের ধরে নিয়ে যায় এবং জেল-জুলুমের ভয় দেখিয়ে তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করে। এদের জোর করে ক্যাম্পে নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং পোষ মানতে বাধ্য করার জন্য বা পলায়ন রোধের জন্য বিভিন্ন রকম কঠিন শাস্তি দেয়া হয় বলে জানা যায়। ১২-১৩ বছরের বালকও এ বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পায় না। ন্যূনতম প্রশিক্ষণের পর তাদেরকে সরকারের বিদ্রোহী দলগুলোর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয়। অন্যদিকে বিদ্রোহীপ্রধান এলাকাগুলোতে জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ডে এদেরকে ব্যবহার করা হয়। যেমন, গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে জোর জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায় করা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্রোহী-সমর্থকদের নির্মমভাবে হত্যা করা ইত্যাদি। ২০০১ সালের প্রথমদিকে সান প্রদেশে এ ধরনের একটি হত্যাযজ্ঞে পনেরজন নারী ও শিশুকে হত্যা করেছিল মাত্র ১৩ ও ১৫ বছরের দুজন বালক-সৈনিক।

আমেরিকাভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ এবং অন্য অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা এমনভাবে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে যেন মিয়ানমারে সরকারি ও বিদ্রোহী উভয় পক্ষ থেকেই নতুন নতুন চাইল্ড সোলজার সৃষ্টির তৎপরতা বন্ধ করা যায় এবং বর্তমানে যেসব সৈনিকের বয়স আঠার বছরের কম তাদের যেন পূর্বের বেসামরিক জীবনে ফিরে যাওয়ার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা

BanglaBook.org

হয়। ১৯টি বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভুক্ত সর্বমোট চাইল্ড সোলজারের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। শুধু সরকারি বাহিনীতেই ১৮ বছরের কম বয়সীর সংখ্যা ৭০ হাজারের কাছাকাছি। দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিণতি এমন হয়েছে যে আজ মিয়ানমারের পথে-ঘাটে উঠতি বয়সের কোনো বালক নিরাপদ নয়, তা সরকারি সেনাবাহিনী বা যে কোনো বিদ্রোহী বাহিনীর কারণেই হোক না কেন!

চাইল্ড সোলজারদের করুণ কাহিনী

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া চাইল্ড সোলজারদের করুণ কাহিনী অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক। আমরা এখানে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করছি :

১. নাইরোবির ১৩ বছর বয়স্ক একজন প্রাক্তন চাইল্ড সোলজার বলেছে, 'ওরা আমাকে মাদকাসক্ত করার জন্য পিল খেতে দিত। এতে আমি যখন বোধহীন হয়ে যেতাম তখন আমি লোকদের মাথায় আঘাত করতে করতে রক্তাক্ত করে দিতাম। যখন আমার নেশা ছুটে যেত তখন আমার মধ্যে অপরাধবোধ জেগে উঠত। যদি লোকটিকে আমি চিনতে পারতাম তবে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতাম। কিন্তু ওই লোক আমার আবেদন গ্রহণ না করলে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগত।'

২. উগান্ডার লর্ডস রেজিসট্যান্স আর্মির হাতে ১৩ বছর বয়সে অপহৃত হওয়া সুশান বলে, 'একটি ছেলে একদিন বিদ্রোহীদের কবল থেকে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে ধরা পড়ে যায়। তার হাত বেঁধে আমাকে ও আরও কয়েকজন নতুন বন্দিকে নির্দেশ দেয়া হল আমরা যেন লাঠি দিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করি। এ কাজ করতে আমার খুব খারাপ লাগল। আমি ছেলেটিকে আগে থেকেই চিনতাম কারণ সে ছিল আমাদের একই গ্রামের। তাই আমি ছেলেটিকে হত্যা করতে পারব না বলে জানিয়ে দিলাম। এতে তারা ধমক দিয়ে বলল, আমি তা না করলে উল্টো আমাকেই হত্যা করা হবে। ওরা যখন আমার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল বাধ্য হয়েই আমি ছেলেটিকে হত্যার কাজে অংশ নিলাম। ছেলেটি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এ কাজ করছ কেন? আমি বললাম, আমি নিরুপায়। আমরা তাকে হত্যা করার পর নেতারা আমাদের বাধ্য করল ছেলেটির রক্ত নিয়ে তা আমাদের গায়ে ও বাহুতে মাখতে। আমরা যাতে মৃত্যুকে ভয় না করি সে জন্যই আমাদেরকে দিয়ে এ কাজ করানো হয়েছিল। তারা জানত যে আমরা আর কখনও পালানোর চেষ্টা করব না। আমি এখনও আমাদের গ্রামের সেই ছেলেটিকে স্বপ্নে দেখি, যাকে আমরা হত্যা করেছিলাম। স্বপ্নে দেখি যে আমি

BanglaBook.org

তার সাথে কথা বলছি এবং সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে—তোমরা কেন বিনা অপরাধে আমাকে হত্যা করেছ? এসব দেখে এখনও আমি স্বপ্নের ভিতর কান্নাকাটি করি।'

৩. গুয়েতেমালা আর্মির ১৪ বছর বয়সে রিক্রুট করা সৈনিক এমেলিও বলে, 'সেনাবাহিনী ছিল আমার জন্য দুঃস্বপ্নের ব্যাপার। তাদের বর্বর ব্যবহার আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল। সাধারণত কোনো কারণ ছাড়াই শুধু ভয়-ভীতির মধ্যে রাখার জন্যই নিয়মিতভাবে আমাদের পিটানো হত। বয়স্ক সৈনিকরা মিলে আমাকে যে রকম নির্দয়ভাবে লাথি মেরেছিল তার জন্য এখনও আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি এবং আমার ঠোঁটের কাটা দাগ এখনও সেই অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কখনও আমাদের যথেষ্ট খাবার দেয়া হত না। অথচ তারা আমাদের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ভারি বোঝা বয়ে নিতে বাধ্য করত। আমাদের ছোট ও ক্ষুধার্ত শরীরের জন্য সেইসব বোঝা ছিল কল্পনাতীতভাবে ভারি। ওরা আমাকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা শিখিয়েছিল। আমরা এমন এক যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম যে যুদ্ধের কারণ আমাদের জানা ছিল না।'

৪. মিয়ানমারের একজন প্রাক্তন চাইল্ড সোলজার বলে, 'বিদ্রোহীদের সাথে যতদিন ছিলাম ততদিনই আমাকে যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে ন্যস্ত রাখা হত। শত্রুদের যাতায়াতের পথে মাইন পাতার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হত এবং রেকি ইত্যাদি কাজের জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করা হত। কারণ একজন অপ্রাপ্তবয়স্ককে সাধারণত গ্রামবাসীরাও তেমন খেয়াল করে না বা সন্দেহ করে না।'

৫. ১১ বছর বয়সে দ্য শাইনিং পাথ নামক পেরুর বিদ্রোহীদের একটি ধর্মীয় মৌলবাদী দল কর্তৃক রিক্রুট করা একটি মেয়ে সৈনিক বলে, 'ওরা যুবক বা বয়স্ক নির্বিশেষে সেখানকার সব লোককেই মারধর করল এবং তাদের সবাইকেই হত্যা করল। দশ জনের মত লোককে ওরা কুকুরের মত হত্যা করল। আমি কাউকে হত্যা করিনি তবে আমি দেখেছি তারা কীভাবে হত্যা করছে। ওদের সাথে যেসব শিশু ছিল তারাও রেহাই পায়নি। হ্যাঁ, অস্ত্র দিয়েই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। ওরা আমাদের হত্যা করা লোকগুলোর রক্ত পান করতে বাধ্য করে। আমরা একটি পাত্রে মৃতদের রক্ত নিয়ে তা পান করেছি। ওরা লোকগুলোকে হত্যা করার পর তাদের বুক চিরে কলিজা-গুর্দা ইত্যাদি বের করে নিয়ে সেগুলোকে টুকরা টুকরা করে ভাজা করার পর আমাদেরকে তা খেতে বাধ্য করল। ওরাও খেলো এবং আমাদের মত ছোটদেরকেও তারা এসব খাওয়ালো।'

BanglaBook.org

মূলত চাইল্ড সোলজার হল দেশে দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়া সমাজ-সংসারের আত্মঘাতী সংঘর্ষের করুণ ফলাফলের শিকার কিছু সংখ্যক শিশু ও কিশোর। এরা নিজেরা সমাজের বৃহত্তর অপরাধের শিকার বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরাই হচ্ছে একেকটি সংঘাতময় স্থানের অত্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচারী। এদের হাতেই ঘটেছে অসংখ্য নিষ্ঠুর ঘটনা। এজন্যই আর্চবিশপ ডেসমন্ড এম টুটুর কথাগুলো অত্যন্ত প্রাণিধানযোগ্য, 'We must not close our eyes to the fact that child soldiers are both victims and perpetrators. They sometimes carry out the most barbaric acts of violence. But no matter what the child is guilty of, the main responsibility lies with us–the adults. There is simply no excuse no acceptable argument for arming children.'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিশিষ্ট ২

শিশুশ্রম

প্রসঙ্গকথা

মানবজীবনের অত্যন্ত সুন্দর ও প্রকৃষ্ট সময় শৈশব ও কৈশোর। পূর্ণবয়স্ক যুবকরূপে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার আগে এই যুবা-পূর্ব সময়টিকে ইংরেজিতে বলে চাইল্ডহুড, যাকে আমরা বাংলায় বলি বাল্যকাল। এটিই জীবনের সূচনা-পর্ব বা উন্মেষকাল। নারী-পুরুষের শরীর ও মন গড়ে ওঠার এটাই সময়। প্রায় সব মানুষের ক্ষেত্রে এ সময়টাতে কর্মের চেয়ে ভাবনাই প্রাধিকার পায় বেশি। তাই বলা যায়, বাল্যকাল হয় স্বপ্ন দিয়ে ভরা আর কল্পনা দিয়ে ঘেরা। দায়িত্বের বোঝা চেপে বসে না বলেই জীবন হয় আনন্দে পরিপূর্ণ। শিক্ষা-দীক্ষার বাধ্যবাধকতা ছাড়া বাকি সময়টুকু ব্যয় হয় খেলাধুলা ও গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে। পরিণত বয়সে মানুষ যেভাবে ব্যস্ত থাকে সংসারের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঠিক তেমনি গুরুত্ব দিয়ে একজন শিশু বা কিশোর খেলাধুলায় বা আবেগপ্রবণ কাজে মেতে থাকে ভীষণ ব্যস্ততা নিয়ে—বাল্যকালটা এতটাই সরলতায় পরিপূর্ণ!

এই সময়টাই মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার উৎকৃষ্ট সময়। তাই বাল্যকালে কারও উপর কাজের বোঝা না চাপিয়ে তার শিক্ষা-দীক্ষার সকল প্রকার আয়োজন, যতটুকু সম্ভব ভালোভাবে, সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়। উত্তম শারীরিক গঠনের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তম মানস গঠনের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, শিক্ষক রেখে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সক্রিয় তৎপরতা চালানো হয়। অভিভাবকরাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চেষ্টা করা হয় এইসব আবশ্যকতা নিয়ে কচি বয়সের কাউকে যেন নিজের ভাবনা নিজেকে ভাবতে না হয়। তাকে ভাবতে হয় না তার নিজের চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যাপারেও। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর ভাগাভাগি করে প্রত্যেক অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের এই সকল আবশ্যিক প্রয়োজন ও দায়-দায়িত্বের সমাধান করবে—এটাই নিয়ম। এটা তাদের জন্মগত অধিকার।

অন্যদিকে প্রতি পদক্ষেপে এদের সঠিক বিষয়টি শেখানোর জন্য তৎপর থাকেন পিতা-মাতা ও মুরব্বিরা। অনেক ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের যথাযথ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বড়রাও নিজেদের কোনো কোনো আচরণকে সংযত করেন, বদভ্যাস পরিত্যাগ করেন ও কাজের ধারাকে বদলে ফেলেন। বয়স্করা সচেতন থাকেন যেন বাল্যকালে কেউ অবহেলার শিকার না হয়, কারও বাল্যকাল যেন

BanglaBook.org

অর্থহীন অশিক্ষা-কুশিক্ষার আবর্তে ব্যর্থ হয়ে না যায়। মানুষের হাজার কোটি বছরের গড়া সমাজ ও সামাজিক নিয়মই তৈরি হয়ে আছে এমনভাবে যেন শিশু-কিশোরেরা বাল্যে সঠিক শিক্ষা ও পরিচালনা পেয়ে গড়ে ওঠে আগামীদিনের কল্যাণকর মানুষরূপে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের এই স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোরদের এই জন্মগত অধিকারকে মূল্য দেয়া ও রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, প্রধানত অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং অশিক্ষা ও সমন্বয়হীনতার কারণে। দুর্নীতির প্রকোপে পড়ে এসব নিয়মনীতি উপেক্ষিত হওয়াটাও এর অন্যতম কারণ। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের শিশু-কিশোরদের বিরাট একটি অংশ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শিক্ষার আলো তারা পায় না, বরং বেঁচে থাকার তাগিদে, ক্ষুৎ-পিপাসার হাত থেকে নিজেকে এবং পিতার পরিবারকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে না গিয়ে শত অনিচ্ছায় যেতে হয় মিল-কারখানা ও বিভিন্ন ধরনের কাজে, শ্রম বিক্রি করার জন্য।

বয়সসীমা

চাইল্ডহুড বা বাল্যকাল কোনটা? এর বয়সসীমা কত? সাধারণভাবে মেনে নেয়া হয় যে বাল্যকাল হল জন্ম থেকে পনের বছর। অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ষোল বছর বয়স থেকেই কাউকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য করা হবে। আবার পাশ্চাত্যের অনেক দেশে আঠার বছর বয়সকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনকি অনেক দেশে আঠার হল ভোটার হওয়ার বয়স। অর্থাৎ সতের বছর বয়স পর্যন্ত কাউকে অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য করা হবে। ইদানীং অনেকে বলছেন, সারা পৃথিবীতেই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সীমা হওয়া উচিত আঠার বছর।

মানব-জীবনের যুবাপূর্বকালের বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় কিছু পরিচিতিমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ইত্যাদি। এসব শব্দের গুণবাচক ব্যাখ্যা আছে কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো বয়সসীমা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কারণ এ ধরনের কোনো বিধান নেই যে বলা যাবে 'আজ তার শৈশবের শেষদিন এবং কাল থেকে কৈশোর শুরু।' তবু কাজের সুবিধার্থে একটি বয়ঃসীমা নির্ধারণ করে নেয়া জরুরি বলে অনেকে মনে করেন, যদিও সর্বক্ষেত্রে এর চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে না। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এ বি এম তালুকদারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বয়সের হিসাবটা এরকম ছোট শিশু (আর্লি চাইল্ডহুড) ১-৫ বছর; বড় শিশু (লেইট চাইল্ডহুড) ৬-

BanglaBook.org

১২ বছর এবং তারুণ্য (এডোলেশন) ১৩-১৮ বছর। অন্যদিকে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষে কিশোর বয়সকে চিহ্নিত করা হয়েছে ১১ থেকে ১৫ বছর হিসেবে এবং শিশু বলতে নির্দেশ করা হয়েছে আট বছর বয়সসীমা পর্যন্ত। তবে ইংরেজি শব্দ 'চাইল্ডহুড' দিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্কতার পুরো সময়কেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ চাইল্ডহুড শব্দের তুলনায় শিশু শব্দটির সময়ের ব্যাপ্তি কম। তবু ব্যাপক অর্থে 'চাইল্ড' শব্দের পরিবর্তে 'শিশু' শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেই হিসেবে শিশুর বয়সসীমা হবে কোনো দেশে পনের বছর আর কোনো দেশে সতের বছর। সেই অর্থেই Child Labour-এর পরিবর্তে এখানে 'শিশুশ্রম' ব্যবহার করা হচ্ছে মূলত 'অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম' বোঝানোর জন্য।

চাইল্ড বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বোঝানোর জন্য আমরা আপাতত পনের বছরকেই সীমা হিসেবে গণ্য করব, বিশেষত শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে। অন্য একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, 'শিশু'র বয়সসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়। 'শিশুশ্রমের' ক্ষেত্রে মেয়েদের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সময়সীমা ছেলেদের তুলনায় ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক ও প্রকৃতির নিয়ম। তাছাড়া বয়স্ক-শ্রমের ক্ষেত্রেও যদি মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে হয় তাহলে অনেক ধরনের কাজ থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া উচিত, শুধু প্রকৃতির প্রতি যথার্থ বিবেচনাবোধের কারণে। কিন্তু নারী অধিকারের বর্তমান উচ্চরবের যুগেও এসব বিবেচনা আন্তর্জাতিকভাবেও গ্রাহ্য হয়নি। এ প্রসঙ্গে শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত দিতে চাই যে 'সুষম-বণ্টন' ও 'সম-বণ্টন' শব্দ দুটি সমার্থক নয়। সমাজ-সংসারের কর্ম-বিভাজনের ক্ষেত্রে নারী অধিকার নিশ্চিত করতে হবে সভ্য সমাজকেই। এই লক্ষ্যে কাজের জন্য পেশি ও মেধাভিত্তিক চাহিদার নিক্তিতে কাজগুলোকে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে দেয়া উচিত, সমভাবে নয়। সে যাই হোক, আন্তর্জাতিকভাবে প্রস্তাবিত শিশু-বয়সের ১৮ বছরের সময়সীমাকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আজও মেনে নেয়নি, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও নয়।

তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে, পনের বছর পর্যন্ত যে বাল্যকাল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তা কি সংরক্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে? সমগ্র পৃথিবীর বিশাল একদল শিশু-কিশোর কি বঞ্চিত হচ্ছে না তাদের শৈশব ও কৈশোর তথা স্বপ্নের বাল্যকাল থেকে? বাল্যকালের শিক্ষা, স্বপ্ন ও আনন্দ থেকে? হ্যাঁ, বাস্তবে তাই হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীর আনাচে-কানাচে নানা দেশে নানা জনপদে।

বিভিন্ন কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশু-কিশোরদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক বাল্যকাল থেকে। প্রধানত দারিদ্র্যের কারণেই শিশু-

BanglaBook.org

কিশোরদের বাধ্য করা হচ্ছে মজুরির বিনিময়ে শ্রম দেয়ার জন্য। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের স্বপ্নসুখের বাল্যকালকে বিপন্ন করে, বিপর্যস্ত করে ও বিসর্জন দিয়ে শিশুশ্রম আদায় করে নেয়া হচ্ছে। পনের বছরের বহু আগেই শিশু-কিশোরকে নাম লেখাতে হচ্ছে শ্রমিকের খাতায়। বড়দের পাশাপাশি তারাও শ্রম বিক্রি করছে উপার্জনের জন্য। এই নির্মমতা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য বৃহত্তর সমাজের সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। সমাজের সচ্ছল অংশের হাত বাড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন অসচ্ছল অংশের প্রতি। অপরদিকে এটাও বাস্তব প্রেক্ষাপট যে সমগ্র বিশ্বের সম্পদ এবং উন্নয়ন সমভাবে ও সমরূপে বিন্যস্ত নয় পৃথিবীর জমিন জুড়ে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত অংশকে মানবিক নিয়মের অমানবিক লঙ্ঘনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এই বিশ্বেরই ধনী ও উন্নত অংশকে। এক্ষণে তো আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি, ইরাকের তৈলভাণ্ডারকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নিজেদের কব্জায় আনার জন্য ধনী ও উন্নত বিশ্ব যেরকম একরোখাভাবে নিরপরাধ মানুষের জীবন ও সম্পদ-বিধ্বংসী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি একরোখা হয়ে তাদেরই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত দারিদ্র্য-বিমোচনের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বকে শিশুশ্রমের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য। খসড়া হিসাব মতে ইরাক আক্রমণ করতে গিয়ে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয়েছে প্রায় দুইশ' বিলিয়ন ডলার। আর ইরাকি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও অন্য দেশগুলির খরচ মিলিয়ে এই যুদ্ধের কারণে পুরো পৃথিবীর ব্যয় হয়েছে পাঁচশ' বিলিয়ন ডলারের অনেক বেশি। অথচ এই বিপুল পরিমাণ অর্থের মাত্র একশ' ভাগের এক ভাগ খরচ করলেও পুরো পৃথিবীর শিশুশ্রম উচ্ছেদ করা যেত অবলীলায়।

হিসাবের খসড়া

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এবং ঘনবসতিপূর্ণ হত-দরিদ্র দেশ। অপ্রতুল আমাদের খনিজ সম্পদ। এই দেশের প্রায় ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগেরই বয়স পনের বছরের নিচে। আর যাদের বয়স আঠার বছরের ঊর্ধ্বে নয় তাদের সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। জনশক্তির এত বিরাট একটি অংশকে কি শ্রম থেকে দূরে রাখা যাবে আমাদের মত দেশে! কিন্তু তাই বলে কৈশোরের প্রারম্ভে কিংবা নিতান্ত শৈশবেই কাজে লাগিয়ে দেয়ার বিষয়টি অবশ্যই অনিয়ম ও অবমাননাকর। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের বিষয়টি নতুন নয়। খুব সহজেই এর একটি খসড়া তৈরি করা যায়। যেমন

১. 'কাজের ছেলে' বা 'কাজের মেয়ে' হিসেবে প্রায় প্রতিটি সচ্ছল, এমনকি মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে যে সকল ছেলেমেয়ে কাজ করে তাদের

BanglaBook.org

অধিকাংশের বয়সই পনের বছরের বেশি নয়। ওদিকে আবার গৃহকর্তা-কর্ত্রীদের প্রায় সবার মধ্যেই 'বুয়া' না রেখে কাজের ছেলে বা মেয়ে রাখার আগ্রহই বেশি। কারণ শিশুদের উপর জোর খাটানো এবং নানা উপায়ে তাদের অপব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে সহজ। অথচ এ ধরনের শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা এত বেশি যে, একজনকে কাজ থেকে বাদ দিলে আরও অনেকজন হাজির হয়ে যায় সেই একই কাজের জন্য। ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য কাজের ছেলে রাখা হয় শহর-গ্রাম নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি দোকানপাটে। জনশক্তির একটি বড় অংশ এক্ষেত্রে শিশুশ্রমে নিয়োজিত। আমাদের দেশের সার্বিক দারিদ্র্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য এত বেশি যে বাসায় বাসায় এ ধরনের শ্রমদান ছাড়াও অসংখ্য শিশু-কিশোর নিয়মিত শ্রম বিক্রি করছে বিভিন্ন কারখানা, মিল-ফ্যাক্টরি, দোকান বা নির্মাণকাজের মত কঠোর কায়িক কর্মকাণ্ডে।

২. 'বারাসাতের ইটভাটায় সাতক্ষীরার শিশুশ্রমিক'দের সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩ সালের ২রা জুন একটি প্রধান জাতীয় দৈনিকে। লিখেছেন একজন শিশু অধিকার কর্মী ও গবেষক হান্নান বিশ্বাস। ক্ষুদ্রঋণের নামে সহজলভ্য দাদন বিলিয়ে সাতক্ষীরার সীমান্ত এলাকার দরিদ্র মানুষগুলোকে আগাম কিনে নিচ্ছে ভারতের বারাসাত এলাকার ইটভাটার মালিকদের নিয়োগ করা দালালরা। পরে ঋণ শোধ করার জন্য পুরুষরা একা কুলাতে না পেরে হাড়ভাঙা এই নির্মম কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছে তাদের স্ত্রী ও শিশু-কিশোর সন্তানদের। দশ-বারো বছরের ছেলে-মেয়েরা বাধ্য হচ্ছে স্কুল ছেড়ে দিয়ে প্রতিবছর প্রায় সাত মাস ধরে শ্রম দিয়ে আসতে সীমান্তের ওপারের ভারতীয় ইটভাটার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। 'এসব শিশুদের কোনো আনন্দময় শৈশব নেই। এরা নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত হচ্ছে পড়াশোনার অধিকার থেকে এবং পুষ্টি ও বিনোদনের অধিকার থেকে। দিনের পর দিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে করতে ও অপুষ্টিকর খাবারের কারণে এদের বুকের হাড় বেরিয়ে যায়। দীর্ঘদিন স্কুলে অনুপস্থিত থেকে ওরা পড়াশোনায় এগোতে পারে না।' দারিদ্র্যের নির্মমতা ও শিশুশ্রমের বাস্তবতা এতটাই মর্মান্তিক। এই পরিস্থিতির জন্যই এসব শিশুকে স্কুলে পাঠানোর সব রকম সরকারি উদ্যোগও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

৩. প্রতিটি বাজারে, স্টেশনে ও জাহাজঘাটায় দেখা যাবে অসংখ্য ছেলেমেয়ে পিলপিল করছে কুলি-মিন্‌তির কাজ করার জন্য। তাদের উপার্জন একান্তভাবেই প্রয়োজন তাদের পিতার পরিবারের জন্য। অপরিণত বয়সেই ওরা ভার বহনের মত কঠিন কাজে নিয়োজিত হয়। নষ্ট পরিবেশে নষ্ট

BanglaBook.org

চরিত্রের মানুষদের সাথে ওরা বেড়ে উঠতে থাকে। শিক্ষা তো নেই বরং কুশিক্ষার মধ্যে ওরা বড় হয়, দুর্ব্যবহার ও দুরবস্থার ঘা খেতে খেতে, জীবনের প্রতি বিরক্ত ও একরোখা হয়ে। কতজন শিশুশ্রমিক নিয়োজিত আছে এমন কুলি-মিন্‌তির কাজে? সঠিক হিসাব দেয়া মুশকিল। তবে হাজার হাজার বাজার এবং রেল, বাস ও লঞ্চস্টেশনে এধরনের শিশুশ্রমিকের সংখ্যা যে বহু লক্ষকেও ছাড়িয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

৪. বিভিন্ন কলে-কারখানায় কর্মরত শিশুশ্রমিকের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের বৃথা চেষ্টা না করে ওদের কর্মকাণ্ডের মোটামুটি একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ক. ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে শিশুশ্রমিকরা কাজ করে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ম্যাচের বাক্সে কাঠি ভরাই তাদের কাজ। ২ গ্রোস অর্থাৎ ১৪৪টি বাক্স ভরতে পারলে পায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ টাকা। ঘিঞ্জি ও নোংরা ঘরে বারুদ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কখনও কখনও দুর্ঘটনাবশত আগুন ধরে যায়। এভাবে আগুনে পুড়ে এ পর্যন্ত অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবু হাজার হাজার শিশুশ্রমিক কাজ করে যাচ্ছে এসব ফ্যাক্টরিতে প্রতিদিন।

খ. বেলুনের কারখানায় কাজ করছে ছয় থেকে শুরু করে দশ-বারো বছরের শিশুরা। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাবারের মণ্ড, সালফিউরিক অ্যাসিড, ময়লাযুক্ত ট্যালকম পাউডারে মাখামাখি করে প্রতিদিন কাজ করে ওরা ১৬ ঘণ্টা করে। কোনো ঝুঁকিকে ওরা ঝুঁকি মনে করে না। সপ্তাহান্তে আয় করে ৪০ থেকে ২০০ টাকা মাত্র। বাবা-মায়েরাও এই আয়ের জন্যই তাদের সন্তানদের পাঠান ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। পিতাদের কথা হল 'শ্রমিকের পোলা বড় অইলে শ্রমিকই হওন লাগব, পড়া-লেখার কাম কী? পড়তে দিলে খামু কী? ফোনরা (বেলুনের স্থানীয় নাম) কারখানায় কাজটা তো অন্তত শিখতাছে।'

গ. চুড়ি কারখানাগুলোর শিশুশ্রমিকরা মূলত মা-বাবার পীড়পীড়িতেই এমন কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যোগ দেয়। দারিদ্র্যের কারণেই হাই-ভোল্টেজ মেশিনে কাজ করার ঝুঁকি তাদেরকে নিতে হয়। এইসব কারখানার পরিবেশ মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পোশাক শিল্প, বুনন শিল্প, চামড়া কারখানা ইত্যাদি সকল প্রকার মিল-কারখানা ও ফ্যাক্টরিতেই শিশুশ্রম ব্যবহার করা হয়। নির্মমতা এই যে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় খুবই কম। অথচ বড়রা যেসব কাজ করতে চায় না সেই সব কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। এ ধরনের শিশুশ্রমিকের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ।

BanglaBook.org

শ্রম বিক্রিতে নিয়োজিত এসব শিশুর কথা বাদ দিলেও শহর এলাকায় গড়ে ওঠা বস্তিগুলোতে এবং এদেশের প্রতিটি গ্রামে অসংখ্য শিশু-কিশোর খুঁজে পাওয়া যাবে যাদের বাল্যকালটা কেটে যাচ্ছে অযত্নে ও অবহেলায়। পিতার সংসারের ক্ষুন্নি নিবারণের জন্য কচু-ঘেঁচু ও শাকপাতা সংগ্রহে দিনভর ব্যস্ত থাকে এমন অসংখ্য শিশু খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের চৌষট্টি হাজার গ্রামের প্রতিটিতেই। এসব লক্ষ লক্ষ শিশুকে আগামীদিনের নাগরিক হিসেবে জীবনের ও দেশের প্রয়োজনে গড়ে তুলবার কোনো সুষ্ঠু পদক্ষেপ বা উদ্যোগ নেই।

১৯৯৫ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী দেশে পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ছিল তেষট্টি লাখ। প্রকৃত অবস্থা যে এরচেয়ে বহুগুণ খারাপ তা বিচার করা খুব কঠিন নয়। সমগ্র বাংলাদেশে কাজের ছেলে বা মেয়ে আছে এমন পরিবারের সংখ্যা অর্ধ-কোটির বেশি। শত শত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে হাজার হাজার শিশুশ্রমিক কাজ করছে বিভিন্ন শিফটে। অন্যান্য মিল-ফ্যাক্টরি ও কুলি-মিন্‌তিদের সংখ্যা আন্দাজ করলে এ দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা দুই কোটির কম হবে বলে মনে হয় না।

ফলাফল : আজ ও আগামীকাল

দুর্বিষহ অভাবের কারণে দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের অভিভাবকদের কাছে শিশু-অধিকার প্রসঙ্গ পরিহাসতুল্য হয়ে গেছে বৈ কি! বাস্তবতা এই যে, অনেক দরিদ্র পরিবার শুধু শ্রমে লাগিয়ে কিছু বেশি আয়ের আশাতেই বেশি সন্তান গ্রহণ করে থাকে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের কথা বা সন্তানের পড়াশোনার বিষয়টি তাদের বিবেচনায় আসে না। জরিপে দেখা গেছে যে কর্মরত শিশুদের অধিকাংশের পরিবারে ভাইবোনের সংখ্যা চার অথবা পাঁচের অধিক। বস্তিগুলোতে অনেক পরিবারেই সন্তান সংখ্যা আট-দশজন।

শ্রমে যুক্ত থাকার কারণেই ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও কামরাঙ্গীরচরে দিনের বেলায় ছয় থেকে বার বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের আনাগোনা মাঠে বা খোলা জায়গায় তেমন একটা লক্ষ করা যায় না। অধিকাংশ শিশু-কিশোর আবার স্কুলেও যায় না। তারা দিনভর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘিঞ্জি ঘরে বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে। কাজের চাপে সময়মত তাদের নাওয়া-খাওয়ার সময়ও হয় না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজের কারণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য ছুটি চাইলে মালিকেরা খারাপ ব্যবহার করে।

শিশুশ্রম বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে দীর্ঘদিন থেকে অনেক কথা বলা হলেও বাংলাদেশের রাজধানীর শিশুশ্রমপ্রবণ এলাকাগুলোতে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে শিশু এবং তাদের অভিভাবক কারওই সে ব্যাপারে

BanglaBook.org

কোনো সচেতনতা নেই। মাত্র পাঁচ বছর বয়স হতেই এসব শিশুর কাজ খোঁজা শুরু হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কিংবা ঝুঁকিমুক্ত যে কোনো কাজ পেলেই যেন বেঁচে যায় ওরা। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এদেশে মোট ৪৩০ ধরনের শিশুশ্রমের মধ্যে ৬৭টিকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করলেও এসব কাজ থেকে শিশুদের সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বরং এগুলোতে শিশুদের অংশগ্রহণ বাড়ছে বলেই সরেজমিনে দেখা যায়।

পাঁচ-দশ বছর পরেই এই সকল শিশুশ্রমিক, কাজের ছেলেমেয়ে ও কুলি-মিন্‌তিরা বড় হবে, হবে শক্ত-সামর্থ্য পূর্ণবয়স্ক যুবক-যুবতী। তখন ওদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা না গেলে বাড়বে বেকারত্ব। যে দেশে ও যে সমাজে বেকাররূপী অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত যুবকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ে সেখানে প্রতিদিনই বাড়বে ছিনতাই, চুরি, সন্ত্রাস এবং কল্পনাতীত অরাজকতা। বেপরোয়া বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা যদি প্রচুর হয় তাহলে যে কোনো ধরনের অপকীর্তির নায়ক খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। তাই এভাবে চলতে থাকলে সমাজের অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে যাবে দিনকে দিন। এমন অবনতিশীল পরিস্থিতিতে সমাজ ও দেশ কেবলই এগিয়ে যাবে অশান্তি ও অনিশ্চয়তার দিকে। জীবনের প্রতি বিরক্ত ও একরোখা হয়ে বেড়ে ওঠা এইসব যুবক-যুবতী যদি পরিণত হয় সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, কালোবাজারির সহযোগী, ভাড়াটিয়া খুনি বা নষ্ট উদ্ধত চরিত্রের একেকজন দুর্বিনীত নাগরিকে তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। আজকের তৃতীয় বিশ্ব দিন দিন ভরে যাচ্ছে এমনি অসংখ্য অ-মানুষে, তথাকথিত ভালো-মানুষেরা যাদের ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে নিজেদের গা বাঁচিয়ে। এদের মতো একরোখা, স্বার্থপর ও কুশিক্ষিত মানুষের জন্যই অনেক দেশে আজ কলুষিত হচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-জীবন। শুধু এশিয়া নয় আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোতে এর জ্বলন্ত উদাহরণ খুঁজতে একটুও বেগ পেতে হয় না।

তাই এক্ষেত্রে সচেতনতা নিয়ে প্রতিকারের কাজ শুরু করতে হবে আজই, এখনই! দারিদ্র্য দূর করতে শিশুশ্রম বন্ধ করে আগামীদিনের সুখী সমাজের নাগরিক গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে।

আশার আলোয় পথ দেখা

এ ধরনের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির ভিতর উৎসাহব্যঞ্জক খবরও কিছু পাওয়া যায়। তারই একটি হল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার বাজার ঢাকার 'বিসিএস কম্পিউটার সিটি' সম্পর্কে। আগারগাঁও এলাকার রোকেয়া সরণিতে এই বিশাল কম্পিউটার বাজারের প্রায় দেড়শ কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে বিপুল সংখ্যক

BanglaBook.org

শিশু। কম্পিউটার প্যাকেট করে রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, এটা-ওটা এগিয়ে দেয়া—এসব কাজই ওদের করতে হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। তাদের পুরো সময়ই কাটে কম্পিউটারের সঙ্গে। এইসব শিশুশ্রমিকের কারও কারও ঘটনা বেশ উৎসাহ জোগায় বটে! সামান্য ক্লিনার থেকে দামী হার্ডওয়ার প্রকৌশলী হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত রয়েছে এখানেই! এ ধরনের ঘটনা অন্যদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। সরেজমিনে জেনে আসা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ নিচে করা হল

১. এখানকার একজন শিশুশ্রমিক বাস করে পাশের বস্তিতে। প্রায় এক মাস হল সে এখানে যোগ দিয়েছে। ইতোমধ্যে কম্পিউটার গেমস খেলতে শিখেছে। তাকে কম্পিউটার প্যাক করা ও প্যাক খোলার কাজ করতে হয়। বড় হয়ে কী হবে জানতে চাইলে সে জবাব দিল, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হব। সে বলেল, 'পড়াশোনা করতে খুব মন চাইছিল কিন্তু বাপ-মায় রাজি না। ভাবলাম কাজ কইরা কইরা আমারেই বড় একটা ইঞ্জিনিয়ার হইতে হইব।' সাত-আট বছরের এই শিশুটি হচ্ছে কম্পিউটার সিটির সর্বকনিষ্ঠ শিশুশ্রমিক। সকাল দশটায় এখানে এসে কম্পিউটার বিষয়ক খুঁটিনাটি শ্রম দিতে সে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং রাত আটটার দিকে কম্পিউটার গেমসের মায়া ভুলে বস্তিতে ফিরে যায়। ওর খুব শখ সে নিজে একটি কম্পিটারের মালিক হবে।

২. ১২-১৩ বছরের অন্য একজন শিশুশ্রমিক প্রতি মাসে বেতন পায় ৮০০ টাকা। তার বিশ্বাস, এভাবে পরিশ্রম করতে করতেই একদিন সে হার্ডওয়্যার বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে। অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটাও বড় কিছু হওয়ার জন্য জরুরি। তাই সে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। সময়ের সঠিক ব্যবহার করার ব্যাপারে সে সচেতন। তার ভাষায়, 'সকাল থেকে দুপুর স্কুলে পড়ব, দুপুর থেকে রাত মার্কেটে কাজ করব। তবে নিজের একটা কম্পিউটার থাকলে সাত দিনেই ইনিঞ্জনিয়ার হতে পারতাম!' এতটাই আত্মবিশ্বাস এই শিশুশ্রমিকের।

৩. অন্য একজন শিশুশ্রমিকের গল্পটা এরকম যে কম্পিউটার সিটির জন্মলগ্নে মাত্র আট বছর বয়সে সে এখানে কাজ করতে আসে। এখন তার বয়স এগার এবং সে-ই এখানকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ শিশু। ওর ভাষায়, 'এখানে চা পানি আনি, টাকা কালেকশন করি, হার্ডওয়্যারের কাজ করি, বিভিন্ন পণ্যের দাম ক্রেতাকে বলি, সিডি-রম, পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক করি, আরও বহুত কাম করি বুঝলেন?' কী সেই বহুত কাম শুনি। 'হেইডা অইল আমি ঝিনুক স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ি।' পড়াশোনার পরও কাজ করতে সমস্যা হয় না তোমার? 'না। আমার দোকানের মালিকেই তো আমারে ওইখানে ভর্তি কইরা দিছে। কারণ আমারে বড়লোক হইতে অইব তো!' কী করে তুমি বড়লোক হবে

BanglaBook.org

শুনি? 'পড়াশুনা আর কম্পিউটার শিখলে বেবাক কিছুই হওন যায়!' জবাবটা এগার বছরের সেই শিশুশ্রমিকের।

৪. রিকশাচালক পিতার ছেলে অন্য একজন শিশুশ্রমিকের বয়সও মাত্র এগার বছর। মাসিক পাঁচশ টাকা বেতনে সে এখানে কাজ নিয়েছে। একমাত্র ছেলেকে এখানে কাজ করতে পাঠিয়েছে তার পরিবার, সহজেই বোঝা যায় অভাবের সংসার তাদের। তার ভাষায়, 'ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ছি, তারপর এইহানে কাজে আসছি। কাজ করতে একদম ভালো লাগে না, তবুও করি।' কম্পিউটারে বিভিন্ন গেমস খেলতে পারে সে। বড় হলে কম্পিউটারের দোকানেই কাজ নেবে? প্রশ্ন করা হলে সে আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল : 'নাহ্! আমি সরকারি চাকরি করমু, গাড়ি-বাড়ি সব থাকব আমার।' বলাবাহুল্য, ভালো পরিবেশে থেকে ওরা ভালো স্বপ্ন দেখতে শিখেছে।

বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে কর্মরত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা জুলাই ২০০৩-এ ছিল প্রায় ৮৫ জন। এদের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই কিন্তু কারিগরি দিক থেকে এদের অধিকাংশই যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ একজন শিশুশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা যায় যে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ক্লিনার হিসেবে এখানে যোগদান করে মাত্র নয়শ' টাকা বেতনে। তিন বছর পর অর্থাৎ ২০০৩ সালে সে রূপান্তরিত হয়েছে একজন দক্ষ হার্ডওয়্যার প্রকৌশলীতে এবং তার বেতন বেড়ে হয়েছে সাড়ে নয় হাজার টাকার বেশি। এভাবেই তো আমাদের শিশুদের বেড়ে ওঠা উচিত উন্নত ভবিষ্যতের স্বার্থে!

আমাদের করণীয়

উপরের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কিছু সিদ্ধান্তে আমরা সহজেই পৌঁছুতে পারি। একথা ঠিক যে, বাংলাদেশ থেকে একদিনেই শিশুশ্রমকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সম্ভব নয়। তবে আমরা যারা সচ্ছল ও শিশুশ্রমের ভোক্তা তারা অত্যন্ত অল্প ত্যাগ স্বীকার করেই যা করতে পারি তা হল, শ্রম আদায়ের পাশাপাশি আমাদের অধীনে কর্মরত শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কার্যকরভাবে চিন্তা-পরিকল্পনা করা এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া। যেমন

১. কাজের পাশাপাশি আমাদের আওতাধীন শিশুশ্রমিকদের মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
২. কাজের বিনিময়ে তাদের যথেষ্ট ও সম্মানজনক পারিশ্রমিক দেয়া।
৩. তাদের আয়ের অংশবিশেষ সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ভিত রচনা করতে সাহায্য করা।

BanglaBook.org

৪. শ্রম আদায়ের পাশাপাশি শিশুশ্রমিকদের জন্য কোনো প্রকার কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়া।
৫. প্রত্যেকেটি শিশুশ্রমিকের মধ্যে উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সৃষ্টি করা ও সেই লক্ষ্য অর্জনে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

আমরা যারা এ দেশের সক্ষম ও সচ্ছল নাগরিক তাদের প্রত্যেককেই ভাবতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে আজকে যারা শিশুশ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে তারা প্রত্যেকে যেন আগামীকাল এ দেশের একজন সুনাগরিক বা 'ইউজফুল সিটিজেন' হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এটাই হবে আমাদের মত অর্জিত-স্বাধীনতার নাগরিকদের জন্য সত্যিকার দেশপ্রেমের প্রমাণ।

অন্যদিকে হঠাৎ করে যেনতেনভাবে বাংলাদেশের শিশুশ্রম বন্ধ করার ফল হবে মারাত্মক। যদি বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য-বিমোচনের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়েই সরকারকে শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য চাপ দেয়া হয় তাহলে কর্মহীন হয়ে পড়বে বিভিন্ন বয়সের দরিদ্র শিশুরা এবং অভাবের করাল গ্রাসে জাতির একটি বিরাট অংশ নিঃশেষ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। যদি ওদেরকে বাঁচাতে হয়, যদি ওদের শৈশবকে বাঁচাতে হয় তবে এই অভিশপ্ত অভাব মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রথমেই। দারিদ্র্য-বিমোচনের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বাংলদেশ সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের পন্থা হিসেবে যদি এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যাতে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য বা রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাহলে সার্বিকভাবে এদেশেরই অর্থনৈতিক দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে। ফল হবে এই যে শিশুশ্রমে নিয়োজিত সকল শিশুরই দৈন্যদশা আরও বেড়ে যাবে অথচ মূল সমস্যার কোনো সমাধানই হবে না। উন্নত বিশ্ব যদি আজ ঘোষণা দিয়ে বসে যে শিশুশ্রম বন্ধ করা না হলে আমরা বাংলাদেশের মালামাল (যেমন, গার্মেন্টস) আমদানি করব না, তাহলে তো সমস্যার সমাধান না করে তার কারণকে আরও অনিবার্য করে তোলা হবে। এতে যে শিশুটি গার্মেন্টসে চাকরি করত সে তার চাকরি হারাবে এবং তার জীবন ও ভবিষ্যৎ আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এতে শিশুশ্রমকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং শিশুদের প্রতি দরদ প্রকাশ করা হবে সত্য কিন্তু যে শিশুটি বাধ্য হয়ে শিশুশ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে প্রকারান্তরে তার সাথে অসহযোগিতাই করা হবে। এমন একটা নাজুক সমস্যার এটা কোনো সমাধান হতে পারে না।

বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলোতে শিশুশ্রম নির্মূল করার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হবে দু'দফায়। পর্যায়ক্রমে যেভাবে আমরা দেশি ও বিদেশি অর্থায়নের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারি তা হল

BanglaBook.org

১. প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, কাজের সময়সীমা, মজুরির হার, শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের কর্মক্ষেত্রের মানকে উন্নত করা।
২. পরবর্তী পদক্ষেপ সার্বিক দারিদ্র্য-বিমোচনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শিশুদের শ্রম বিক্রয়ের অবস্থা থেকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা।

সত্যি বলতে কি, সুযোগ পেলে শিশু বা তাদের অভিভাবক কেউই চাইবে না শিশুদের শৈশবকে বিসর্জন দিয়ে শ্রম বিক্রয়ে প্রবৃত্ত করতে। শুধু দারিদ্র্যের কারণেই শিশুশ্রম 'গ্রহণযোগ্য অপরাধ' হয়ে গেছে এদেশের মানুষের কাছে। এমনকি শিশুশ্রম বিক্রির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশেও পাচার হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য দরিদ্র শিশু। সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও কল্যাণকামী নাগরিকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আর্থিক সহায়তা ও প্রেষণার (মোটিভেশন) মাধ্যমে এই গর্বিত জাতি ইনশাল্লাহ একদিন শিশুশ্রমের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবেই!

শিশুশ্রমের জঘন্য রূপ

শিশুশ্রমেরই অন্য একটি হিংস্র ও জঘন্য কিন্তু বাস্তবরূপ হচ্ছে শিশু-কিশোরদের সৈনিক হিসেবে কাজ করানো। পরিস্থিতির শিকার হয়ে যে সকল শিশু-কিশোর বাধ্য হল চাইল্ড সোলজার বা শিশু সৈনিক হিসেবে কাজ করতে, তার তো বাল্যকালই কেবল ধ্বংস হয়ে গেল না বরং বিপর্যস্ত হয়ে গেল সমগ্র জীবন। এর প্রতিকারের লক্ষ্যে বিশ্ব-বিবেককে সোচ্চার হতে হবে।

পনের বছরের কম বয়স্কদের সরকারি বা বেসরকারি বাহিনীতে সশস্ত্র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্টের নীতিমালায় যুদ্ধাপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় একটি ঐচ্ছিক প্রটোকলের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সশস্ত্র বাহিনীতে রিক্রুটমেন্টের ন্যূনতম বয়সকে ১৮-তে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১৮-এর নিচের ছেলেমেয়েদের যে কোনো জবরদস্তিমূলক রিক্রুটমেন্টের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১৯৯৯ সালের গৃহীত প্রস্তাবে ১৮ বছরের নিচের নারী-পুরুষের সশস্ত্র (সরকারি বা বিদ্রোহী) বাহিনীতে রিক্রুটমেন্টকে শিশুশ্রমের নিকৃষ্টতম রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

BanglaBook.org

তথ্যসূত্র

১. Adu Boahen with J. F. Ade Ajayi and Michael Tidy, *Topics in West African History*, Longman Group UK Limited, 1986.
২. Abdul K. Koroma, *Sierra Leone The Agony of a Nation,* Andromeda Publications, Freetown, Sierra Leone, 1996.
৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা।
৪. *The Daily Star* পত্রিকায় প্রকাশিত হিউমেন রাইটস ওয়াচ-এর একটি প্রতিবেদন, ১৩ জুলাই ২০০৩, ঢাকা।
৫. ইন্টারনেট।
৬. Rachel Brett, *Recruiting Child Soldiers: The Link between displacement and recruitment.*

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org